পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১১

প্রদান উপলক্ষে

স্মা র ক গ্র ন্থ

সম্পাদনা

সুকুমার বাগচি

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

প্রাক্-কথন ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

সবিনয় নিবেদন ॥ **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৯

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম ॥ **প্রশান্ত চক্রবর্তী** ॥ ১১

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস-এর জীবন ও সাহিত্য ॥ **শ্যামসুন্দর বসু** ॥ ২৮

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব :
এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত ॥ **বীরেন্দ্রনাথ দত্ত** ॥ ভাষান্তর : **প্রসূন বর্মন** ॥ ৩৫

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা ॥ **বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য** ॥ ৪৮

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **শ্রী অজিৎ বরুয়া** ॥ ৭১

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য** ॥ ৭২

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **শ্রী হীরেন ভট্টাচার্য** ॥ ৭৩

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়** ॥ ৭৪

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৭৫

মতামত ॥ ৮০

সম্পাদকের নিবেদন

এই স্মারকগ্রন্থের সমস্ত রচনাই যেহেতু বাংলাভাষায় প্রকাশিত সেহেতু এবার এটি সম্পাদনাকালে অসমিয়া বাক্যেও আমরা বাংলা হরফ ব্যবহার করেছি, দেওয়া হয়েছে অসমিয়া অংশের বঙ্গানুবাদও। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপ না-থাকায় অসমিয়া উদ্ধৃতিগুলিতে অন্তঃস্থ ব-এর জায়গায় প্রচলন অনুযায়ী 'য়' এবং কোথাও কোথাও মূল অসমিয়া উচ্চারণ বজায় রাখার জন্য 'অ' ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিবন্ধটি অসমিয়া থেকে অনূদিত। তাই অসমিয়া উদ্ধৃতিগুলোও প্রথমে বঙ্গানুবাদে রেখে মূল অসমিয়া পাঠ পরে বন্ধনীর ভেতর দেওয়া হয়েছে।

গতবার পুরস্কৃত কবিদের সচিত্র পরিচয় শুধু একটি আলাদা ফোল্ডারে ছাপা হয়েছিল, স্মারকগ্রন্থে স্থান পায়নি। এবার সেই ত্রুটি সংশোধন করা হল। দু-বছরের চারজন পুরস্কৃত কবিরই সচিত্র পরিচয় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া 'মতামত' বিভাগটি এবার সংযোজিত হল।

গতবছরের স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং রামনাথ বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংবলিত রচনা দুটি এবারও প্রয়োজনবোধ পুনর্মুদ্রিত হল। পার্থক্য একটাই, পদ্মনাথ সম্পর্কিত নিবন্ধে এবার অসমিয়া উদ্ধৃতিগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

একাধিক গ্রন্থে বানিয়াচং রাজবংশের যে-কুলপঞ্জি প্রকাশিত তা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছে। সে-কারণে আমাদের অনুরোধে ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য নিজে প্রচুর পরিশ্রমে কুলপঞ্জিটির যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন, স্মারকগ্রন্থের শেষাংশে সেটি সংকলকের বক্তব্য সহ ছাপা হল।

প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি, এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

আরও একটা কথা। শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের নিবন্ধটিতে বাংলা ভাষায়ও এ-রাজ্যের নাম 'অসম'-এর পরিবর্তে 'আসাম' মুদ্রিত হয়েছে লেখকের নিখিত নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে।

প্রাক্-কথন

আমার বাবা রমানাথ ভট্টাচার্য নিজে একজন কবি, একই সঙ্গে অন্যের কবিতার প্রতিও রয়েছে তাঁর গভীর ভালোবাসা। এককথায়— তিনি কবিতা-অন্ত-প্রাণ। আবার, আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবন, চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে। অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বাবার অসীম অনুরাগের মূলেও পদ্মনাথের পঁচিশ বছরের শ্রমের ফসল 'কামরূপশাসনাবলী'-কে চিহ্নিত করা যায়। অনুরূপ ভালোবাসা থেকেই বাবা ১৯ জন অসমিয়া কবির ৮৯টি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন 'আধুনিক অসমিয়া কবিতা' এবং নীলমণি ফুকনের ৫১টি অনূদিত কবিতার সংকলন 'পড়োশি গোলাপ'। অন্যদিকে রামনাথ বিশ্বাসের সংস্কারমুক্ত সংগ্রামী জীবন ও বিশ্বপর্যটনের অভিজ্ঞতা বাবার মনে বুনে দিয়েছে উদারতার বীজ।

এইসব কারণে, বাবার নামে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন গঠনের পরে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং উল্লিখিত দুই পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে প্রতিবছর পদ্মনাথ-রামনাথ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর কবিতার প্রতি বাবার বিশেষ অনুরাগের কথা মনে রেখে এটাও স্থির করা হয় যে পুরস্কার দুটি দেওয়া হবে অসমিয়া ও বাংলা ভাষার দুজন কবিকে— তাঁদের জীবনজোড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা চাই, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের সূচনাতেও তাই মহাপুরুষ শংকরদেবের বরগীতের সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাদের অন্য এক স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ রচিত একটি সুপরিচিত ভক্তিগীত। কামনা করি, সম্প্রীতির বাতাবরণে সকলের জীবন সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
২৫ মার্চ, ২০১২

সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারপ্রাপকের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সশ্লিষ্ট কবিদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন সংশ্লিষ্ট ভাষার দুজন বিখ্যাত লেখক : স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী গতবছর ১৩ মার্চ আয়োজিত পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে পদ্মনাথ ও রামনাথ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা ও শ্রী তরুণ মুখোপাধ্যায়।

২০১১ সালের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। এবার প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে শ্রীদত্ত ও শ্রীভট্টাচার্যের বক্তৃতা দুটি মুদ্রিত হল। আর পদ্মনাথ ও রামনাথ সম্পর্কে গতবছর বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী প্রশান্ত চক্রবর্তী এবং শ্রী শ্যামসুন্দর বসু— লেখা দুটি গতবারের স্মারকগ্রন্থে ছাপা হয়েছিল, এবারও প্রয়োজনবোধে দুটিই পুনর্মুদ্রিত হল।

২০১১ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতিপুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতিপুরস্কার ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি হীরেন ভট্টাচার্য এবং কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

রমানাথ ভট্টাচার্য

সভাপতি

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
২৫ মার্চ, ২০১২

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম

প্রশান্ত চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ একজন মহান গবেষক-পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এ-যুগে প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃতপ্রায়। স্বল্পসংখ্যক ইতিহাসের ছাত্র-পণ্ডিতের মধ্যেই তাঁর স্মৃতি অবশিষ্ঠাংশ হয়ে আছে। আজ যে-মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'-র জন্ম শতবর্ষ সমাগত। আর, এই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' কিন্তু এই পণ্ডিতপ্রবরেরই মানস-সন্তান। এটা আমার কথা নয়। স্বয়ং স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ কনকলাল বরুয়া লিখেছেন— 'The idea of founding the society [কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি] was first conceived by Pandit Padmanath Bhattacharya Vidyavinod.'[১]

কনকলাল বরুয়া-উচ্চারিত সেই নাম মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। কটন কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক। শতবর্ষ-প্রাচীন কটন কলেজের ইতিহাসেও পদ্মনাথ আজ প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম।

তবুও সুখের কথা, ইতিহাস কথা বলে। বিস্মৃতির আড়ালেও রেখে যায় পদচিহ্ন। যে-জন্য পদ্মনাথকেও সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্য, কটন কলেজের আরেক খ্যাতনামা পণ্ডিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পদ্মনাথের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অসাধারণ তথ্যবহুল জীবনী প্রণয়ন করে গেছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই জীবনীতে যদিও জীবনী অংশ কম এবং কর্মরাজির অংশ বেশি, তবু পদ্মনাথ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে এই পুস্তিকাটি একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন এই জীবনী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল নথি হিসাবে যে-ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি গ্রহণ করেছিলেন, সেটি হল— শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত পদ্মনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'শোকসিন্ধু'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুআরি; সিলেট শহরের তোপখানা থেকে। লক্ষণীয়, পদ্মনাথের প্রয়াণের চার মাসের মাথায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে পদ্মনাথের জীবনাবসান হয় ১৯৩৮-এর ৩০ অক্টোবর।।

'শোকসিন্ধু'-তে শ্রীশচন্দ্র একটি পদ্যে প্রথমেই পদ্মনাথের জীবনের নানা কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে গদ্যে জীবনী অংশ। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে এই দুটি গ্রন্থের তথ্য গ্রহণ করেছি।

॥ দুই ॥

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের জন্ম ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ১৭৯০ শকাব্দ)।[২] শ্রীহট্টের কসবা বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়, রাজ-কাত্যায়ন বংশে। পিতা পঞ্চানন, মা হরসুন্দরী। শৈশবে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৬৯-জানুআরি)। তখনও অন্নপ্রাশন হয়নি। ধাত্রীমাতা তারাসুন্দরী দাসীর কোলেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। চার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে পরম যত্নে লালন-পালন করেন তারাসুন্দরী। পদ্মনাথ এই মহীয়সী নারীর ঋণ সারা জীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পরবর্তীকালে ধাত্রী মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি পুকুর খনন করিয়েছিলেন।[৩]

পদ্মনাথের পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর শৈশব তাই আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই কেটেছে। বিদ্যারম্ভের পর তাঁকে পিসতুতো দাদা মথুরানাথ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি 'বোধোদয়' পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর বানিয়াচঙের লোকনাথ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতি হন ১৮৭৯-তে। ১৮৮২-তে তিনি সিলেট সরকারি স্কুলে ভরতি হন। এই সময়ে তিনি অগ্রজ পরমানন্দ কবিচন্দ্রের সঙ্গে থাকতেন। কবিচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। অনুমান করা যায়, পদ্মনাথের জীবনে এই কবিচন্দ্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ওই স্কুল থেকেই পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং তদানীন্তন সমগ্র 'আসাম প্রদেশ'-এ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮-তে এফএ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা কলেজে বিএ ক্লাসে ভরতি হন। বিএ শ্রেণিতে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অনার্স নিয়েছিলেন। পরে তাঁর একান্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক উইলসন সাহেবের নির্দেশে দর্শন শাস্ত্রেও অনার্স নেন। তিনটি বিষয়ে অনার্স থাকায় তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত; দৈনিক আঠারো ঘণ্টা পড়তেন তখন। এ-সময়ে তিনি ইতিহাসে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'ডনেলি মেডেল' লাভ করেন এবং ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় 'লেইজ প্রাইজ' পান।

১৮৯০-এ পদ্মনাথ তিন-তিনটি বিষয়ে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন। ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণি, সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণি। তারপর কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভরতি হলেও পরে ইংরেজি বিষয় নিয়ে ঢাকায় পড়তে যান। এই সময়েই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'ঢাকা সারস্বত সমাজ' কর্তৃক 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন। পরে তা 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে রূপান্তরিত হয়।

১৮৯২-এ তিনি ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন।

॥ তিন ॥

এপ্রিল ১৮৯৩-এ পদ্মনাথ সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তখন কলেজে একজন অধ্যাপক একটি বিষয়ই পড়াতেন—অথচ পদ্মনাথ পড়াতেন চারটি বিষয়—ইংরেজি, সংস্কৃত, লজিক ও ইতিহাস।

১৮৯৩-এর নভেম্বর মাসে পদ্মনাথ ১০০ টাকা বেতনে শিলঙের আসাম সেক্রেটারিয়েটে যোগ দেন। ওই চাকরির কার্যকাল ১৮৯৬-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পদ্মনাথের জীবনের এই শিলং-পর্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। গোটা উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষলগ্ন তখন। এদিকে ১৮৯৪-এ (১৭ বৈশাখ, ১৩০১ বাং) কলকাতায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' স্থাপিত হয়; কিন্তু তার আগেই শিলঙে 'শিলং সাহিত্য সভা' স্থাপিত হয়ে গেছে ১৮৯০-এ। শিলঙেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর শাখা স্থাপনের লক্ষ্যে শিলং সাহিত্য সভার কর্মকর্তারা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। শিলং থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রথম চিঠি লেখেন শিলং সাহিত্য সভার সম্পাদক হরিচরণ সেন। পরিষদ স্থাপিত হয় ১৭ বৈশাখ, আর হরিচরণ সেন শিলং থেকে চিঠি লিখছেন ২ আশ্বিন ১৩০১ বাংলায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পরবর্তী বৈঠকে হরিচরণের চিঠিটি পঠিত হয়। এ-বিষয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস'-এ বলা হয়েছে: 'সারা ভারতবর্ষব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-পরিষদ স্থাপন পরিকল্পনার ইহাই সূচনা।'[৪]

পদ্মনাথ যেখানেই যেতেন সেখানেই কোনো-না-কোনো সাংগঠনিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তেন। ১৮৯৩-এ শিলঙে চাকরি করতে এসেও এ-ধরনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পদ্মনাথ। তাঁর নিজের মুখেই সে-কথা শোনা যাক :

'রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্বপ্রথম আমাকে আসামের রাজধানী খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শিলং সহরে যাইতে হইয়াছিল।

সেইস্থলে কতিপয় বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "শিলং সাহিত্যসভা" নামক একটি পুস্তকাগার ছিল; ইহাকে অন্বর্থনামা করিবার জন্য ইহার একটি সমালোচনী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইত।...

এই সাহিত্য সভার সদস্যগণ "সাহিত্যসেবক" নামে একখানি মাসিক পত্র কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক সমিতির সভ্যরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।'[৫]

কটন কলেজে যোগদানের পাঁচ বছর আগেই গুয়াহাটিতে পা রেখেছিলেন পদ্মনাথ। দিনটি ছিল ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর। তখন পদ্মনাথ অধ্যাপক হিসাবে আসেননি, সরকারি কর্মচারী হিসাবে এসেছিলেন। আসলে ঘটনাচক্রে তাঁকে আসতে হয়েছিল। কর্মজীবনের সূচনায় পদ্মনাথের গুয়াহাটিতে পাকাপাকি চলে আসার নেপথ্যে ছিল কয়েকটি সংঘাতপূর্ণ ঘটনা। এ-জন্য তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্বের দিকে লক্ষ করা যাক। শিলঙে আসাম সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত অবস্থায় এই সংঘাতের সূচনা। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। পদ্মনাথের জীবনী-প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

"এই সময়ে Mr. Gait আসাম সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আসামের এক ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রকাশ করিলে, সুপণ্ডিত পদ্মনাথ তাহার অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া একখানা ইংরেজী পুস্তিকা (A critique on Mr. Gait's History of Assam) প্রণয়ন করেন এবং তাহাতে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় Gait সাহেবের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। শুনা যায় ইহার বিষময় ফলেই তাঁহার কেরাণী জীবনের উন্নতি চিরতরে বিনষ্ট হয়।"[৬]

গেইট সাহেব অবশ্য বইটির পরের সংস্করণে পদ্মনাথের কথা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছিলেন।

যা হোক, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ায় পদ্মনাথ শিলং ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা শুরু করলেন। সে-সুযোগও এসে গেল। সুরমা ভ্যালির সেকালের প্রসিদ্ধ ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স রায়সাহেব নবকিশোর সেন তখন অবসর গ্রহণ করেন। পদ্মনাথ সেই ফাঁকা পদে যোগ দিয়ে (১৮৯৭-এর ১ জানুআরি) জন্মভূমি শ্রীহট্টে চলে যান।

এই সময়ে সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার কাজে নিজেকে আরও বেশি করে জড়িত করেন পদ্মনাথ। শ্রীহট্টের ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি তুলে দেন 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রণেতা অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে। শুধু তা-ই নয়, ওই মহাগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভারও বহন করেন তিনি। পদ্মনাথের সে-সময়ের কর্মব্যস্ততা প্রসঙ্গে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"তাঁহার চাকরিজীবন নানা কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাব্ ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্দের নিয়া এক সম্মিলনে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া সারা বৎসরের কার্যের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা চালাইতে থাকেন। পণ্ডিতসভায় আহূত হইয়া সম্মিলনে সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার পাঠ্য নির্ধারণপূর্বক ডি.পি.আই-এর নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন...।"[৭]

কিন্তু ওই রিপোর্টে কাজ তো হলই না, পরে উক্ত ডি.পি.আই-এর সঙ্গেই তাঁর মতানৈক্য চরমে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন :

'এই সময় Dr. Booth আসাম শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার ছিলেন। সরকারী কোন বিষয়ে স্বাধীন অভিমত প্রদান করিয়া উক্ত সাহেবের সহিত তাঁহার বিষম মনোমালিন্য ঘটে। ডাক্তার বুথ তাঁহার স্বমতে মত দিতে পণ্ডিত পদ্মনাথকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি অতিশয় অবজ্ঞার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হয়। Dr. Booth তাঁহাকে নানা ভয় দেখাইয়াও যখন বাধ্য করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে গৌহাটীতে বদলী করেন।'[৮]

অথচ সে-সময়ে অসমে ডেপুটি ইনস্পেক্টরদের বদলি করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

যা হোক, গুয়াহাটিতে এলেন পদ্মনাথ। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই আবার তাঁকে অন্য কর্তব্যে ঠেলে দেওয়া হল। সরকারি নথির ভাষায় 'On special duty in connection with Census Work, from 7th March 1901।'[৯]

পদ্মনাথ যখন গুয়াহাটি এসেছিলেন তখন কটন কলেজ স্থাপনের কাজ জোরকদমে চলছে। ৭ মার্চ ১৯০১-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব সেন্সাস হিসাবে গুয়াহাটিতেই দায়িত্ব

নিয়েছেন তিনি, আর দু-মাসের মধ্যেই (২৭ মে ১৯০১) কটন কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কটন কলেজ স্থাপনের লগ্নে পদ্মনাথ শহরেই ছিলেন অথচ কটন-সংক্রান্ত কোনো নথিপথে তাঁর উল্লেখ নেই। কলেজ উদ্‌বোধনের দিন গৌরীপুরের রাজা প্রভাত বড়ুয়া রাজবাড়ির পাখোয়াজবাদক সহ এসেছেন, শিলং থেকে নেমে এসেছেন কটন সাহেব সহ সরকারি বড় বড় আমলারা, গুয়াহাটির সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত— কিন্তু পদ্মনাথের নাম কোথাও নেই। পদ্মনাথ কি সেই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন?

তবে সেই সময়ের অন্য একটি ঘটনার কথা পদ্মনাথ স্বয়ং নিজের লেখায় উল্লেখ করেছেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা হয়ে অসম সফরে এসেছেন। ভ্রমণসূচিটা এ-রকম : প্রথমে কামাখ্যা-দর্শন, তারপর শিলং, সেখান থেকে আবার গুয়াহাটি। বিবেকানন্দের জীবনী-প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখছেন :

> "ঢাকা হইতে স্বামিজী কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটীতে কয়েকদিন বিশ্রাম করিতে হইল। গৌহাটীতে স্বামিজী তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্যব্যক্তির অভাবে উহার কোন নোট লওয়া হয় নাই।" [১০]

বিবেকানন্দের এই পরিভ্রমণকালে পদ্মনাথ বিবেকানন্দের মুখোমুখি হয়েছিলেন কয়েকবার। দুজনের মধ্যে মতবিনিময়ও হয়েছিল। কুড়ি বছর পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৭-এর ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'আসামে বিবেকানন্দ' নামে স্মৃতিচারণমূলক লেখায় পদ্মনাথ বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। স্বয়ং পদ্মনাথের ভাষায়ই শোনা যাক সেই বৃত্তান্ত :

> "...তখন গৌহাটীতে সেন্সাস্ আপিস ছিল—সেই আপিসে কাজ করিতাম। ... ১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটী সহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ ও দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন—তাঁহার জননীও না কি ঁকামাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি সুবৃহৎ 'বাঙ্গলো' ঘর দেওয়া হয়—এবং গৌহাটীস্থ সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।" [১১]

সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন বিকেলে জনৈক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পদ্মনাথ বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে সেই বাংলোতে গেলেন। বারান্দায় টুলের উপর গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা এক ভদ্রলোক একা বসেছিলেন। চুল এলোমেলো, পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল। পদ্মনাথ ভাবলেন বোধহয় স্বামীজির কোনো 'চেলা'। তাঁকেই পদ্মনাথ স্বামীজি সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন। সেই ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন— 'তা, আপনাদের কী কথা আছে বলুন।' পদ্মনাথ চিনতে পারলেন। লিখেছেন : 'তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ।'

প্রথম সাক্ষাৎ মন্দ হল না। প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে কথা হল। কথা গড়াল তর্ক-বিতর্কে। পদ্মনাথ ত্রিশ-বত্রিশের যুবক। বিশ্বখ্যাত সন্ন্যাসীর সঙ্গে অসমের উদীয়মান তরুণ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ জমে উঠল। পদ্মনাথ খানিকটা উত্তেজিতও হয়েছিলেন। ফলে সেদিন আলোচনায় ইতি টেনে চলে এলেন।

কিন্তু মনের ভেতর রেশটা থেকেই গেল। ইতিমধ্যে শোনা গেল, সংক্রান্তির দিন কামাখ্যাদর্শন সেরে স্বামীজি পরদিন বশিষ্ঠ আশ্রমে যাবেন। পদ্মনাথ ভাবলেন, বশিষ্ঠ আশ্রমে স্বামীজির সঙ্গে কথোপথনের সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে। কোনো কারণে স্বামীজি বশিষ্ঠ গেলেন না। পদ্মনাথ ক্ষুণ্ণ মনে শহরে ফিরে এলেন। ফিরেই শোনেন, স্বামীজির বক্তৃতা হচ্ছে। শুনেই ছুটলেন সেদিকে।

লোকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া মুশকিল। পদ্মনাথ জনতার পেছনে কোনোক্রমে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে অসমের বিশিষ্ট সংস্কৃত-পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্যের সঙ্গে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হয়ে গেছে। [১২] সভা নিস্তব্ধ। স্বামীজি বারবার কোনো একটা প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করতে বলছেন, কিন্তু কেউই এগিয়ে এল না। স্বামীজি তখন জানতে চাইলেন— 'সেই ভট্‌চার্জি কোথায়?' পদ্মনাথ লিখছেন : "খোদ 'ভট্‌চার্জি' জনতার অন্তরালে"। যে-কোনো কারণেই হোক-না কেন পদ্মনাথ চুপ করে গেলেন।

গুয়াহাটিতে আবার বিবেকানন্দ-পদ্মনাথ সামনাসামনি হয়েছিলেন। এবং তা স্বামীজির শিলং থেকে ফেরার সময়। এবার একান্তে, নির্জনে, শুধু দুজনে কথা হল। পদ্মনাথ লিখেছেন:

> "...তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িকভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজি শুনিয়াছি, যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার

জন্মে— এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?' তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন— 'ভট্‌চাজ মহাশয়, বল্‌ব, বল্‌ব।' আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই। কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম— তাহা যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন এস্থলেও না বলাই সঙ্গত।"[১৩]

পদ্মনাথ ঠিকই লিখেছেন; স্বামীজির শরীর তখন খুব খারাপের দিকে। তাঁর জীবনী-লেখক জানাচ্ছেন :

"ঢাকাতেও স্বামিজীর শরীর ভাল ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কামাখ্যা হইতে স্বামিজী যখন গৌহাটী ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমধিক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।"[১৪]

বিবেকানন্দকে এত কাছে পেয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পদ্মনাথের। তবু তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বে। সবশেষে তাই লিখেছেন : 'মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত একটি কেশরী।'

॥ চার ॥

১৯০২-এর ২ জুন পদ্মনাথকে আবার সুরমা ভ্যালিতে পূর্বপদে পাঠানো হয়। ১৯০৫-এর ১ মে-তে তাঁর পদোন্নতিও ঘটে। সেই সময় তদানীন্তন চিফ কমিশনার স্যার বেমফিল্ড ফুলার সব স্কুল সাব-ইনস্পেক্টরদের ডেপুটি পদে উন্নীত করেন এবং জনৈক প্রমোদকুমার বসুকে সুরমা ভ্যালির ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। পদ্মনাথ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। পদ্মনাথের বিরোধীরা প্রচার করেন—এ-কাজের আড়ালে পদ্মনাথের হাত রয়েছে। সিলেটে বিশাল প্রতিবাদ সভাও হয়। সরকারি উকিল রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেবকে দিয়ে ঘটনাটির তদন্ত করানো হয়। তদন্তে পদ্মনাথের কলঙ্ক ঘুচল ঠিকই কিন্তু পদ্মনাথ চাকরিতে ইস্তফার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। সরকারের কাছে এই মর্মে এক চিঠি লেখেন যে— হয় তাঁকে কটন কলেজের প্রফেসর নিযুক্ত করা হোক, অথবা চিঠিটিকে পদত্যাগপত্র রূপে গণ্য করা হোক।

অবশেষে কটন কলেজে এলেন পদ্মনাথ। দিনটি ছিল ১৫ জুন ১৯০৫ । তাঁকে সংস্কৃত ও ইতিহাসের 'প্রফেসর' হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

॥ পাঁচ ॥

পদ্মনাথ যখন কটন কলেজে এলেন, কটন তখনও ততটা জমজমাট হয়ে ওঠেনি। গুটিকতক ছাত্র ও হাতে-গোনা অধ্যাপকমণ্ডলী। তবে কয়েকবছর গড়াতেই উজ্জ্বল অধ্যাপকরা আসতে শুরু করেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরও জমজমাট হয়ে ওঠে। এদিকে গুয়াহাটিতে তখন অসমিয়া-বাঙালির যৌথ প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। শোনা যায়, ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আর্যনাট্য সমাজ'-এর জমি দান করেছিলেন অনারেবল মানিকচন্দ্র বরুয়া। মাঝেমধ্যে অসমিয়া নাটকও এখানে অভিনীত হত। গোপীনাথ বরদলৈয়ের দাদা ইন্দ্রেশ্বর বরদলৈ, কুমুদেশ্বর গোস্বামী, মানিকচন্দ্র চৌধারি প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট অসমিয়া অভিনেতারা এতে অংশ নিতেন। সে-আমলে অনেক বাঙালি অভিনেতাও অসমিয়া নাটকে অভিনয় করতেন। এ-রকম একজন অভিনেতা ছিলেন রমেশ সরস্বতী।[১৫]

এদিকে ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন হঠাৎ অসম ভ্রমণে আসবেন বলে ঘোষিত হল। সাজ সাজ রব। মানিকচন্দ্র বরুয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সংগৃহীত হল চৌদ্দ হাজার টাকা। জাজেস ময়দানে বিরাট সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল ১৩ মার্চ। খরচ হল ছয় হাজার। বাদবাকি টাকায় একটা পাবলিক হল করার প্রস্তাব তোলেন মানিকচন্দ্র। ওই বছর সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হল কার্জন হল। প্রথম সেক্রেটারি মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী।[১৬] লাইব্রেরিয়ান গোপালকৃষ্ণ দে।

সময়টা তো খুব স্পর্শকাতর ছিল। সবে ১৮৭৩ সালে অসমিয়া ভাষা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আবার সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৮৩৬ থেকে ওই সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার দখলদারিকে অসমিয়া মহলের অধিকাংশই মেনে নিতে পারেননি। দূরত্ব ও তিক্ততার পরিবেশ তীব্র রূপ নিচ্ছিল। এবং বাঙালিদের ষড়যন্ত্রেই অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি 'নিজ ঘরে পরবাসী' হয়েছে— এই ধারণাটি ক্রমশ 'মিথ'-এ পরিণত হচ্ছিল। সেই বিদ্বেষের দিনে বাঙালি গোপালকৃষ্ণ অসমিয়া-বাঙালির মিলনক্ষেত্র তৈরি করতে চাইছেন নিজে অসমিয়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে— এটা কম গৌরবের কথা নয়। সরকারি উকিল কালীচরণ সেনও এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কালীচরণের প্রতি অসমিয়া সমাজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এমন ছিল যে তাঁর

কাছেই তাঁরা টাকা-পয়সা জমা রাখতেন। অর্থাৎ কালীচরণ নিজেই এক জীবন্ত ব্যাংক ছিলেন। তাঁকে বলা হত অসমিয়া মানুষের ব্যাংক।[১৭] সেকালের পরিস্থিতিতে এ-সব কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কালীচরণ ও তদানীন্তন সরকারি উকিল দীননাথ সেনের চেষ্টায় গৌহাটি মিউনিসিপ্যালিটির তরফে শুক্রেশ্বরে সংস্কৃত টোল স্থাপিত হল। সম্পাদক দীননাথ সেন। মাসিক ৩০ টাকা বেতনে আনানো হল পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্যকে। সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হল এটি ধর্মসভা। গুয়াহাটির দেওয়ানি সেরেস্তাদার ললিতমোহন বাগচী, মুন্সেফ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, কালীচরণ সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় এ-সব হচ্ছিল।[১৮] যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীকালে (১ জুন, ১৯১০) ধীরেশ্বরাচার্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি গুয়াহাটির বাংলাভাষী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সংস্কৃতিমনস্ক লেখক প্রকাশচন্দ্র সিংহ।[১৯] বাঙালি সমাজের প্রতিনিধিবর্গ সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে অসমিয়া সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করছিলেন তখন। হাতে তুলে নিচ্ছিলেন নতুন নতুন পরিকল্পনা ও শুরু হচ্ছিল নয়া প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে অসমের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার পরিবেশ দানা বেঁধে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষ দশকে বিষয়টি সরকারি স্বীকৃতি পেল। এ-প্রসঙ্গে পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর জীবনী-প্রণেতা বেণুধর শর্মা লিখেছেন :

> "বঙ্গদেশত বিজলী ছাহাবে জাতি-উপজাতিবিলাকর ইতিবৃত্ত লেখিবলৈ যি প্রকারে অনুসন্ধান কার্য্য চলাইছিল, সেই প্রকারেরেই অসমতো বুরঞ্জী আরু বুরঞ্জীমূলক সাহিত্যর অন্বেষণ করিব লাগে বুলি এডোআর্ড গেইটে হেঁচি ধরাত তেতিয়ার অস্থায়ী চীফ কমিশনার চার জেমচ লায়ালে বঙ্গদেশর আর্হিরে অসমতো জাতিতত্ত্ব বিভাগ (এথন'গ্রাফী) এটি পাতিলে; আরু সেই বিভাগটো পরিচালনা করিবলৈ অনেরেরী ডাইরেকটরর (অধুনুআ সঞ্চালকর) ভার দিলে এডোআর্ড গেইটক।"[২০]

(বঙ্গদেশে বিজলি সাহেব জাতি-উপজাতিদের ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে যেভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই অসমেও ইতিহাস ও ইতিহাসমূলক সাহিত্যের অন্বেষণ হওয়া উচিত বলে এডোআর্ড গেইট দাবি উত্থাপন করেন এবং এর ফলে তদানীন্তন চিফ কমিশনার স্যার জেম্‌স লায়াল বঙ্গদেশের আদলে অসমেও জাতিতত্ত্ব বিভাগ (এথনোগ্রাফি) স্থাপন করলেন; আর সেই বিভাগটি পরিচালনা করার জন্য অনারারি ডিরেক্টরের (অধুনা সঞ্চালকের) ভার দিলেন এডোআর্ড গেইটকে।)

গেইট সাহেবের অসম-ইতিহাস অনুসন্ধানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন অসমিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী। ইনি প্রচুর অসমিয়া ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তখন। অসমের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার সেই সময়ে হেমচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণির গবেষক। ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ গেইট সাহেব এথনোগ্রাফি ডিরেক্টর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পি. আর. টি. গর্ডন। হেমচন্দ্রের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি প্রবল আসক্তি তখন তুঙ্গে। এ-সব দেখে হেমচন্দ্রকে কামরূপে বদলি করে আনা হল। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্র গোস্বামীর যোগাযোগ হল— মণি-কাঞ্চন যোগ। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্র গোস্বামীর বন্ধুত্ব একই নেশার সূত্রে। দুজনেই একই পথের যাত্রী।

॥ ছয় ॥

১৯০৯-এ (২ ফাল্গুন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) গুয়াহাটির কার্জন হল লাইব্রেরিতে বঙ্গীয় সমাজের একটি সভা আহ্বান করা হয়। এতে উপস্থিত হলেন মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, উকিল রামদাস ব্রহ্ম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রকাশচন্দ্র সিংহ, কমিশনার অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট প্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত, কটন কলেজিয়েট স্কুলের হেডপণ্ডিত ও হেডমাস্টার যথাক্রমে রামতনু ন্যায়সাংখ্যচঞ্চু ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কটনের আরবি-ফারসি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল্লা আবু সৈয়দ প্রমুখ অনেক গুণীজন। সভাপতি 'অশেষ শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ চন্দ্রমোহন গোস্বামী', ইনি সেই সময়ের অসমের বিখ্যাত হেডমাস্টার ছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনী 'মোর জীবন-সোঁঅরণ'-এ অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর এই পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাইয়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন।[২১] ইনি পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ারও মাষ্টারমশাই ছিলেন।

ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী' সভার সভাধ্যক্ষের পদে বৃত হন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। কার্য-সম্পাদক : কটনেরই আরেক বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দু-সপ্তাহের মাথায় ১৩ ফাল্গুন ১৩১৫ এর প্রথম অধিবেশন বসে। সেখানে 'নিবেদন' শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন

সভাধ্যক্ষ পদ্মনাথ। পরিষ্কারভাবে ওই সভার উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করেন তিনি :

"এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আসাম প্রদেশকে বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সাহিত্য মুখে সবিশেষ পরিচিত করিয়া দেওয়া। আসাম বঙ্গদেশের অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইলেও ইহার বিষয় বঙ্গীয় অনেক সাহিত্যসেবী নানারূপ উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিয়া ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন যে বঙ্গবাসিগণ এখনও আসামের প্রকৃত তথ্য বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন।

"যে সকল বাঙ্গালী এখানে থাকিয়া আসামের অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং এতদ্দেশ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গবাসিবর্গের গোচরীভূত করা।"[২২]

অসমের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা-ইতিহাস সম্পর্কে রাজ্যের বাইরে, বিশেষত বঙ্গদেশে বরাবর একটা নেতিবাচক ধারণা, কুসংস্কার ও উন্নাসিকতা যে ছিল সে তো বলাই বাহুল্য। পদ্মনাথ প্রথম থেকেই এ-সবের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। পাশাপাশি অসমের ইতিহাস তথা সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে অসম সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সারাজীবন রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯০৭) বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকায় (সম্পাদক : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) পদ্মনাথ এক নিবন্ধের শুরু করেছেন তাঁর ওই অসম-বিষয়ক ভাবনা দিয়েই :

"ইদানীং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এবং গোয়ালন্দ ডাকজাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে আসাম প্রদেশে যাতায়াত অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে যখন মাত্র মাল জাহাজ ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসিত, তখনও আসাম আসা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুটা সুগম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্বে যখন জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে পর্বতভেদী রাস্তা মাত্র গতায়াতের উপায় ছিল তখন আসামে ভিন্নস্থানের লোক আসিতে চাহিত না। যাহারা আসিত তাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আসিত; দেশে অনুপায় না হইলে কেহ এখানে আসিত না। একবার আসিলে পথক্লেশ স্মরণ করিয়া এবং স্বদেশের অসচ্ছলতা ইত্যাদি ভাবিয়া সহজে বড় কেহ ফিরিয়া যাইতে চাহিত না, এইখানেই বিবাহাদি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই নিমিত্তই বোধহয় প্রবাদ হইয়াছিল, "আসামে আসিলে ভেড়া বনিয়া যায়"।

"যখন অবস্থা এই ছিল, তখন ভাল লোক আসামে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া যে আসামের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবে তাহার সম্ভাবনাও কম ছিল। সুতরাং আসামের ইতিহাস কেহ বড় জানিত না। না জানাটা বড় একটা যে ক্ষতির বিষয় ইহাও কেহ মনে করিত না। ফল কথা আসাম ও ইহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে বঙ্গদেশে একটা ঔদাস্য-অবহেলার ভাবই পরিলক্ষিত হইত।

"তখন মা কামাখ্যাই আসামকে বহির্জগতের সঙ্গে কিছুটা জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।"[২৩]

প্রথমাবধি পদ্মনাথের মনে হয়েছিল বৃহত্তর অসম নানাভাবে অবেহেলিত। বহু ভাষা-উপভাষা, বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, দীর্ঘ বর্ণময় ইতিহাস ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। এ-জন্য পদ্মনাথ নব উদ্যমে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে এ-অঞ্চলকেই বেছে নিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বাঙালি সমাজের গোপালকৃষ্ণ দে, কালীচরণ সেন, মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী প্রমুখ আর পাশাপাশি অসমিয়া সমাজের হেমচন্দ্র গোস্বামী, ধীরেশ্বরাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে সূর্যকুমার ভূএগ্রা অসম-ইতিহাস অনুসন্ধানের এই ধারাটিকেই মহাস্রোতে পরিণত করেছিলেন। সূর্যকুমার, বস্তুত, সেই সময়ের এই আন্দোলনেরই ফসল বলাটা অত্যুক্তি হবে না। মনে রাখতে হবে যে সূর্যকুমার তখন সবে কটন কলেজের তরুণ ছাত্র। ১৯০৯-১১ সালে তিনি কটনে ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন পদ্মনাথ সহ কটনের বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদদের। এঁদের কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সূর্যকুমারের উপর গভীরভাবে পড়েছিল। পরবর্তীকালে তাই তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে পদ্মনাথের কথা লিখে গেছেন এভাবে :

"I read Sanskrit at his feet at the Cotton College. On my joining that institution as a teacher he gave me valuable advice regarding my duties to my colleagues and students. We respected him for his character, and for his steadfast devotion to the cause of historical research."[২৪]

পদ্মনাথের নেতৃত্বে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-র প্রতিটি বৈঠকে তাই অসম-বিষয়ক ভাবনাই মূলত গুরুত্ব পেতে শুরু করল। নির্দিষ্ট লেখকেরা একের পর এক তুলে আনলেন এতদঞ্চলের মাটি-মানুষকে।

প্রাপ্ত নথি অনুসারে দেখা যায়, ১৩ ফাল্গুন ১৩১৫ থেকে ৪ পৌষ পর্যন্ত মোট আটটি অধিবেশনে লেখকরা যে-সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেগুলোর বিষয় বৃহত্তর অসমের নানা দিক। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উদ্ধার করা যেতে পারে :

ক) 'রাণী জয়মতী' : গোপালকৃষ্ণ দে (১৫ চৈত্র ১৩১৫)
খ) 'বাণ ও শোণিতপুর' : উমেশচন্দ্র দে (১২ বৈশাখ ১৩১৬)
গ) বলবর্মার তাম্রশাসন : ধীরেশ্বরাচার্য (৯ শ্রাবণ ১৩১৬)
ঘ) আসাম ভ্রমণ : পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৩ ভাদ্র ১৩১৬)
ঙ) আসাম গৌরব চরিতাবলী : গোপালকৃষ্ণ দে (১৩ ভাদ্র ১৩১৬)
চ) অসমীয়া পদ্মপুরাণ : নিশিকান্ত বিশ্বাস (১৭ আশ্বিন ১৩১৬)
ছ) ভীষ্মক ও কুণ্ডিন : দেবনারায়ণ ঘোষ (১২ অগ্রহায়ণ ১৩১৬)
জ) রি-থ্লেন বা খাসিদের সর্পপূজা : প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (৪ পৌষ ১৩১৬)

গুয়াহাটির এই জমজমাট সাহিত্য-আসরে বঙ্গীয় সমাজের সর্বস্তর থেকে যোগদান করেছিলেন উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। অসমিয়া সমাজের রথীমহারথীরা অনেকেই এর সদস্য ছিলেন; যেমন—ধীরেশ্বরাচার্য, হেমচন্দ্র গোস্বামী, নবীনচন্দ্র বরদলৈ প্রমুখ। এমন-কি দু-একজন সাহেবও এর সদস্য হয়েছিলেন। সভা অনুষ্ঠিত হত কার্জন হল লাইব্রেরির সভাগৃহে। অনারেবল মানিকচন্দ্র বরুয়াই এর ব্যবস্থা করে দেন। কটন কলেজের প্রিন্সিপাল সুডমার্সন সাহেব কলেজের বেঞ্চ-টুল ইত্যাদি ব্যবহারের ঢালাও অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, "কলেজ বোর্ডিং-এর ছাত্রগণকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত কালেও সভায় অবস্থানের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক ছাত্রদিগকে সভার প্রবন্ধাদি শ্রবণে উৎসাহিত করিয়া সভাকেও সমুৎসাহিত" করেছিলেন ঋষিকল্প সুডমার্সন সাহেব।[২৫]

অসমের ইতিহাস-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই সভা মজবুত ভিত তৈরি করেছিল বিংশ শতকের প্রথমেই। অসমের অতীতকে পদ্মনাথ সহ কটনের এই প্রণম্য শিক্ষকেরা নানাভাবে বৃহত্তর বঙ্গীয় সমাজের সামনে তুলে ধরতে চাইছিলেন। সভাধ্যক্ষ পদ্মনাথের মুখে তাই শুনি : 'এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আসাম প্রদেশকে বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সাহিত্য মুখে সবিশেষ পরিচিত করিয়া দেওয়া।' 'প্রধান উদ্দেশ্য' যে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল তা একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। সতী জয়মতীর কাহিনি অসমের মানুষের কাছে আবেগপূর্ণ একটি ঘটনা; এবং জয়মতীর আত্মত্যাগের ইতিহাস শুধু অসমের মধ্যেই জ্ঞাত ছিল তখন। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র এইসব উদারচেতা মানুষের দ্বারা সে-সময়ে বঙ্গদেশে প্রথমবারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয় জয়মতী-কাহিনি। এ-কাজে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন গোপালকৃষ্ণ দে। জয়মতী-বিষয়ক তাঁর লেখা 'ভারত মহিলা'য় প্রকাশিত হয়। পরে সম্ভবত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়ও লিখেছিলেন তিনি।

॥ সাত ॥

ওই সময়ের আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনসায়াহ্নে পদ্মনাথ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কামরূপশাসনাবলী' সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র চতুর্থ অধিবেশন হয়েছিল ৯ শ্রাবণ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। এ-দিনের সভায় কামাখ্যানিবাসী পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্য 'বলবর্ম্মার তাম্রশাসন' প্রদর্শন করেন এবং শাসনটি পাঠ করে এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছিল অসমের নগাঁও জেলায়। দু-তিন হাত ঘুরে শাসনটি ধীরেশ্বরাচার্যের হাতে পড়ে এবং তিনি বাংলা ভাষায় এর ইতিহাস ও ব্যাখ্যা সম্যকভাবে তুলে ধরেন সভায়। এ-বিষয়ে পদ্মনাথ তখনও অভিজ্ঞ ছিলেন না। বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার উক্ত দিনটি থেকেই অসমের প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। 'কামরূপশাসনাবলী' সম্পাদনা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন :

'ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যস্ত ছিলাম না; বলবর্ম্মার শাসনখানির আলোচনায় ও বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিল।'[২৬]

এখানে উল্লেখ্য, ধীরেশ্বরাচার্যের কাছ থেকে নিয়ে মহামতি গেইট শাসনটিকে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. হর্নলি (Dr. Hoernle) শাসনটির সচিত্র অনুবাদ সহ পাঠ প্রকাশ করেন। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'য় মূল তাম্রশাসনটি হাতের কাছে পেয়ে পদ্মনাথ এ-বিষয়ে উৎসাহিত হন। কেননা, তিনি ড. হর্নলির পাঠে ও অনুবাদে

বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি লক্ষ করেছিলেন। পদ্মনাথ সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যায় 'বলবর্ম্মার তাম্রশাসন' নামে এক নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সেই সময় সভার সক্রিয় সদস্য অসমিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী ধর্মপালের আরেকটি শাসন উদ্ধার করেন। পদ্মনাথ সেটিরও পাঠ উদ্ধার পূর্বক বঙ্গানুবাদ করে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩২২/২য় সংখ্যা) প্রকাশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, অসমের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র মধ্য দিয়ে এবং পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন এর মূল কাণ্ডারি। পদ্মনাথ কীভাবে এই উদ্ধারপর্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে 'কামরূপশাসনাবলী'র ভূমিকায়। সত্যি কথা বলতে-কি, এরই চূড়ান্ত রূপ হল 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'। পদ্মনাথের ভাষায়:

> "ইতোমধ্যে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র সহিত সম্পর্ক ঘটে—তাহাতে ইহার কার্য্যগণ্ডীর ভিতরে আসামকে ভুক্ত করা হয়। সন ১৩১৮ সালে কামাখ্যাধামে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়—তদুপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনার্থ 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' সংস্থাপিত হয়। তাহাতে সংকল্প করা হয়, যে ঐ সমিতির পক্ষে আমি প্রাচীন কামরূপের তৎসময় পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত শাসনগুলির পুনরালোচনা পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে ঐসকল প্রবন্ধ 'কামরূপশাসনাবলী' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করিব।"[২৭]

'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'য় যে-বীজ প্রোথিত হয়েছিল, তিন বছরের মাথায় তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ মহিরুহে পরিণত হল। 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি', বস্তুত, 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র অসম-বিষয়ক স্বপ্নেরই বিস্তৃত রূপ।

॥ আট ॥

'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' থেকে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'—এই উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সেটি হল 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর সঙ্গে অসমের যোগাযোগ। অসমের ইতিহাসে এই যোগকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী বলে চিহ্নিত করা উচিত। এ-বিষয়টি এ-যাবৎ উপেক্ষিত ও প্রায় অনালোচিত হয়েই রয়েছে।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ় রংপুরে (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সভাপতিত্বে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর শুভারম্ভ হয়। সেই বছরই ১৮ ও ১৯ মাঘ বগুড়া (এটিও বর্তমানে বাংলাদেশে) শহরে এর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্মর্তব্য, ওই বছরই (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) ২ ফাল্গুন গুয়াহাটির কার্জন হল লাইব্রেরির সভাগৃহে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-র জন্ম হয় এবং প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ ফাল্গুন। সময়ের দিক থেকে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' ও 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' সমসাময়িক। ফলে, এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ ঘটা স্বাভাবিক। এবং হলও তা-ই। সুযোগ করে দিয়েছিলেন নামনি (lower) অসমের গৌরীপুর রাজবংশের স্বনামধন্য রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-র দ্বিতীয় সম্মেলনে রাজাবাহাদুরের প্রেরিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। রাজা প্রভাতচন্দ্র 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশন তাঁর গৌরীপুরস্থ রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

সেই অনুসারে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুআরি (৯ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) শনিবার ও ২৩ জানুআরি (১০ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রবিবার গৌরীপুর রাজবাড়ির মহামায়া মন্দির প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরের ৩৭, রাজশাহীর ৫, দিনাজপুরের ৩, বগুড়ার ১১, কোচবিহারের ৮, পাবনার ২, কামাখ্যার ১, গুয়াহাটির ৭, গোয়ালপাড়ার ২০, বিজনির ১, গৌরীপুরের ৩০ জন প্রতিনিধি নিয়ে ওই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহকারী সম্পাদক বোমকেশ মুস্তোফি, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গুয়াহাটি থেকে যোগ দিয়েছিলেন কামাখ্যা পাহাড় নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য এবং পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, গোপালকৃষ্ণ দে, মল্লনারায়ণ দাস, কুমার হংসধর সিংহ চৌধুরি, বিষ্ণুরাম চৌধুরি, মথুরামোহন বরুয়া (তখন 'অ্যাডভোকেট অব আসাম'-এর সম্পাদক) ও কন্দর্পনারায়ণ বরুয়া। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বয়ং রাজা প্রভাতচন্দ্র। সম্পাদক : রাজবাড়ির দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী— কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতা।

গৌরীপুররাজ প্রভাতচন্দ্র বরাবর বিদ্যোৎসাহী। জন্মভূমি অসমের সঙ্গে তাঁর যেমন আত্মিক সম্পর্ক তেমনি প্রতিবেশী বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ। গৌরীপুর ভৌগোলিক দিক থেকে অসম-বঙ্গ সীমান্তে বলে উত্তরবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ সহ গোটা বঙ্গদেশের সঙ্গে গৌরীপুরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অসমের নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাতচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন । আবার বঙ্গদেশও তাঁর বিদ্যানুরাগের সুফল পেয়েছিল। ১৯০৩-এ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর গৃহনির্মাণ তহবিলে ২০০ টাকা দান করার তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে।[২৮] বঙ্গ ও অসমের নৈকট্যের সন্ধানেই প্রভাতচন্দ্র 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' অসমে অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে কোনো ত্রুটি রাখতে চাইলেন না তিনি। অসমের তাবড় তাবড় সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর কাছে যেমন তাঁর আমন্ত্রণপত্র গেল, তেমনই সারা বঙ্গদেশেও তিনি চিঠি পাঠালেন। চিঠি এল পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের কাছেও। পদ্মনাথ খুবই আনন্দিত হলেন। কেননা, নানা কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন-এর আগের দুই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ক'দিন পর পদ্মনাথের কাছে প্রভাতচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু যেদিন গুয়াহাটি থেকে গৌরীপুর রওনা দেওয়ার কথা তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৮ জানুআরি মঙ্গলবার, ১৯১০, ফের একটি টেলিগ্রাম এল পদ্মনাথের কাছে। রাজাবাহাদুর তাঁকে উক্ত সম্মেলন-এর মূল সভাপতি পদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পদ্মনাথের হাতে একদিন সময়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে অবশেষে এরই মধ্যে তাঁকে সভাপতির অভিভাষণ তৈরি করতে হল।

এদিকে, প্রত্যেক সাহিত্য সম্মেলনে সাধারণত যা হয়ে থাকে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটল না; অর্থাৎ সাহিত্যিকদের ভ্রমণ। বঙ্গদেশের সাহিত্যিকরা অসমে এসে কামাখ্যা দর্শন করবেন না— এটা কী করে হয়! তাঁদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল : অসমিয়া সাহিত্যিকদের সঙ্গে মত বিনিময়। এই দুই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯ জানুআরি বুধবারে বঙ্গীয় সাহিত্যিকরা গুয়াহাটি এসে উপস্থিত হলেন। তখন সবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপিত হয়েছে। আমিনগাঁওয়ে নেমে ফেরিতে পাণ্ডুঘাট। পাণ্ডুঘাটে গুয়াহাটির নেতৃস্থানীয় সরকারি উকিল কালীচরণ সেন, মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এবং কামাখ্যার পাণ্ডা বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা দলৈ অতিথিদের সাদরে বরণ করলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের দলে ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পাণ্ডুঘাট থেকে তাঁরা সরাসরি কামাখ্যা গেলেন। পাণ্ডা বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতে ভোজনাদি হল। বিকেলে তাঁরা ভুবনেশ্বরীর চূড়া থেকে নদী-পাহাড়ের কোলে শায়িত মনোরম গুয়াহাটিকে দু'চোখ ভরে দেখলেন।

ওই দিনই সন্ধ্যায় (১৯ জানুআরি, ১৯১০) 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র দ্বারা অতিথিবর্গকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কটন কলেজের শিক্ষক-ছাত্র সহ শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত। প্রেক্ষাগৃহ ভরতি । হেমচন্দ্র গোস্বামী, নবীনচন্দ্র বরদলৈ, রায়বাহাদুর ভুবনরাম দাস সহ অসমিয়া সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এদিনের সভায় উপস্থিত থেকে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এই বিশেষ সভা সম্পর্কে 'THE BENGALEE' কাগজ বেশ বড় রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধার করা যায় :

"North Bengal Lterary Conference

Some Delegates' visit to Gauhati.

...A public reception was offered to them by the leading men of Gauhati, in the evening, at the local theatre hall,[২৯] which was fully pacted. Pandit Padmanath Bidyabinode, President, Gauhati Literary Society, read a paper welcoming the delegates, and narrating shortly the useful work done by the Society. Babu Ram Das Brahmo, pleader delivered a speech giving interesting historical facts regarding Assam... . Babu Banomali Chakraborty, Professor, Cotton college, thanked the delegates for taking the trouble of coming to Gauhati to meet them. A sweet song brought the proceedings to a close. The meeting was a splendid success."[৩০]

রাত্রে মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর বাড়িতে জমকালো ডিনার পার্টি হল। মহেন্দ্রমোহনের এই আদি বাড়িটি গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারে নদীর দিক থেকে শিখমন্দিরে ঢোকার পথের ধারে আজও একই রকম দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়াত নীরেন লাহিড়ীর

বাসভবনের ভেতর আসাম-টাইপ ঘর সেটি।

জানুআরি ২২ (১৯১০ খ্রি.) শনিবার গৌরীপুর রাজবাড়ির মহামায়া মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হল বহু আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন পদ্মনাথ; কেননা তিনিই সভাপতি। ফুল, পাতা ও বিচিত্র পতাকা দ্বারা বিশাল বিশাল তোরণ তৈরি করা হয়েছিল সারা গৌরীপুরে। উৎসবমণ্ডপও সাজানো হয়েছিল দৃষ্টিনন্দন করে। "মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তৃত সুরচিত মঞ্চের উপর সভাপতির জন্য সুচারু কারুকার্য্যখচিত রজতাসন সংস্থাপিত করা হয়। হরিদ্বর্ণের লতা পল্লবরচিত সুরম্য স্তম্ভ সংন্যস্ত বিচিত্র আলেখ্যাবলী সভার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছিল।"

সকাল ন-টায় রৌপ্যদন্ত সংযুক্ত লোহিতবর্ণের রেশমি পতাকাধারী বিশাল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সভাপতি পদ্মনাথকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন রাজা প্রভাতচন্দ্র। ধীরেশ্বরাচার্যের সংস্কৃত শ্লোক, মৌলবি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম সাহেবের কোরান, বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের দুর্গাস্তোত্র ইত্যাদি পাঠ, কলকাতার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উদ্‌বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা প্রভাতচন্দ্র স্বাগত ভাষণে বললেন :

> "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে...। তাই সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গে এত গৌরব ও আদরের জিনিষ। শুধু বঙ্গের বলিয়াই বা বলি কেন? ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। এই পরিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসামেও নানা স্থানে স্থানে প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার ও ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহার্থ তুল্য সমিতি গঠিত হইলে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।"[৩১]

গৌরীপুররাজের ভাষণে একটি ব্যাপার খুবই স্পষ্ট যে, তিনি চেয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মডেলে অসমেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। এই ভাবনারই চূড়ান্ত রূপ 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'। প্রকৃতপক্ষে, এই ভাবনাটি সর্বাগ্রে পদ্মনাথ সহ গুয়াহাটির বঙ্গীয় সমাজের নেতাদের মনেই এসেছিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তাঁরা গুয়াহাটিতে কাজ শুরু করেছিলেন। আর সে-উদ্দেশ্যেরই ফলশ্রুতি 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'। গুয়াহাটিতে আগমনকারী বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের সামনে পদ্মনাথ বলেছিলেন : "ইহাকে ['গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-কে] কালে পরিষদের [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের] একতম শাখারূপে পরিগণিত করিবারও সংকল্প আছে।" এই সংকল্প যে অচিরেই কার্যকর হয়েছিল সেটা বোঝা যাবে এই তথ্যটি থেকে : পরিষদের ৮ নং শাখা রূপে স্বীকৃতি পায় "গৌহাটী শাখা"। কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের তারিখটি হল : ১০ কার্তিক ১৩১৮। সুতরাং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর 'গৌহাটী শাখা'র প্রতিষ্ঠাকাল ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ মানে ইংরেজি ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর গৌরীপুর অধিবেশনের একবছরের মধ্যেই রাজা প্রভাতচন্দ্রের স্বপ্নের প্রাথমিক বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল পদ্মনাথ প্রমুখের কার্যাবলির মধ্য দিয়ে। তবে একটি ব্যাপার অনুমান করতে দ্বিধা নেই, সেটি হল : পদ্মনাথ বুঝেছিলেন যে কেবল 'বঙ্গীয়' অভিধায় ভূষিত হলে এতদঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা অসম্ভব। এ-জন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর গুয়াহাটি শাখাকে স্বতন্ত্র রেখেই নতুন করে পরের বছরই অর্থাৎ ১৯১২-তে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এঁরা। তাপর্যপূর্ণ কথা হল, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর কামাখ্যায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশনে। সাহিত্য পরিষদের গুয়াহাটি শাখার দীর্ঘ ইতিহাস এর পরের কাহিনি। ১৯৩১-এ 'কামরূপশাসনাবলী'র ভূমিকায় পদ্মনাথ লিখেছিলেন : "বর্ত্তমানেও ইহা ['গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।" এই উজ্জ্বল শাখাটি আজ কালগর্ভে বিলীন বটে, কিন্তু কয়েক দশক আগেও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ছিল। যতদূর জানা যায়, এই শাখার সর্বশেষ সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক ছিলেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক সেন। ষাটের দশকের ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য অস্থিরতা এই শাখাটিকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে।

যা হোক, সভাপতির ভাষণে পদ্মনাথ দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, তখন অসমিয়া-বাঙালির ভাষা সমস্যা নতুন মোড় নিচ্ছে গোয়ালপাড়া জেলাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষাবিচ্ছেদ' নামক বিতর্কিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। পদ্মনাথ এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। বলা যেতে পারে পদ্মনাথের এই বক্তব্যটি

নিয়ে অসমিয়া সমাজে ঝড় উঠেছিল। কী বলেছিলেন পদ্মনাথ সেদিন? সমন্বয়ের কোনো বাণীই কি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি? তাহলে অধিবেশনের শেষপর্বে তিনি যা বলেছিলেন তা পরখ করা যাক—

"আমার অভিভাষণ আকর্ণনানন্তর কোনও কোনও আসামবাসী মহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমরা বুঝি অসমীয়া ভাষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে বঙ্গ ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মৎপঠিত অভিভাষণে এবং অসমীয়া প্রবন্ধে ঈদৃশ আশঙ্কার পরিপোষক কোনও কথাই নাই। আমি স্পষ্ট করিয়া পুনরপি বলিতেছি যে, অসমীয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে ভাষাটি যাহাতে সংস্কৃতানুসারী হয়, উহাই বাঞ্ছনীয়। যেন আমরা (বঙ্গভাষিগণ) তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারি, যেন আমরা অসমীয়া সাহিত্য হইতে আসামের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে অনায়াসে সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।"[৩২]

অসমিয়া ভাষার প্রতি পদ্মনাথের প্রকৃত শ্রদ্ধা যে ছিল উপর্যুক্ত বক্তব্যই তার প্রমাণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, পদ্মনাথের ওই ভাষণ প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এই ভাষণের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। 'অসমীয়া গৌরীপুরত বঙলা সাহিত্য সভা' নামে তা বেরিয়েছিল 'বাঁহী' ১ম বছর ৯ম-১২শ সংখ্যায়। লক্ষ্মীনাথ একে বাঙালি-সম্প্রসারণবাদী চিন্তা রূপেই গণ্য করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথের সমালোচনার পর অসমিয়া জাতীয়-জীবন থেকে পদ্মনাথের অবদান একেবারে মুছে ফেলা হয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। কেননা, পদ্মনাথের সমস্ত জীবনের মূল অধ্যয়ন-ক্ষেত্র ছিল অসম। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশে পদ্মনাথের রচনার একটা তালিকা দিয়েছি। এই তালিকা থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে, পদ্মনাথের মধ্যে অসম-প্রাণতা কী ধরনের ছিল। পদ্মনাথের প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অবিচার হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পদ্মনাথ-লক্ষ্মীনাথ বিতর্ক এক বিশাল অধ্যায়। আপাতত সে-বিষয়ে গেলাম না।

॥ নয় ॥

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ যে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে মূল প্রস্তাবক ছিলেন তা সম্প্রতি নতুনভাবে আমাদের গোচরে এসেছে। অসম সাহিত্য সভার ভূতপূর্ব সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ-বিষয়ে যা লিখেছেন তা হুবহু তুলে ধরছি—

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই করা সমালোচনার পিছত আজিকোপতি এটা সন্দেহ আরু অবিশ্বাসর ভাব দেখা যায়— সঁচায়ে তেনে আছিল নে তেওঁ? কিন্তু পদ্মনাথর অন্য এটা দিশো বোধকরোঁ সামান্য হ'লেও অবহেলিত। 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা, কামরূপশাসনাবলীর প্রণেতা পদ্মনাথে অসম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রত এটা উল্লেখনীয় ভূমিকা যে পালন করিছিল— সেই কথা বিভিন্ন অসমীয়া বরেণ্য সাহিত্যিকে লিখি থৈ গৈছে। অতুল চন্দ্র বরুয়া প্রণীত 'শরৎচন্দ্র গোস্বামী' নামর জীবনীগ্রন্থত এনে তথ্য পোআ যায়। সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজরিকাই অসম সাহিত্য সভার রূপরেখা (পৃষ্ঠা ১৪) গ্রন্থত 'অসম সাহিত্য সভা স্থাপনর পূর্বরঙ্গ' শিতানত লিখিছে :

"সেই উপলক্ষে যোরহাটলৈ যোআ অসমর বিভিন্ন স্থানর মুখিয়াল লোকসকলে বিষ্ণুরাম হলত গোটখাই এখন অসমীয়া সাহিত্য সভা... পাতিবলৈ কুরুংকারাং করিছিল। মেঘে গাজিলে, কিন্তু বরষুণ নহ'ল। সেই চনতে গুয়াহাটীর অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভার এক বৈঠকত অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ে 'অসম সাহিত্য সন্মিলন' এখন গঠন করি তার পরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন'লৈ প্রতিনিধি পঠাবর বাবেও এটা প্রস্তাব দিছিল। পিছে, ঘাইকৈ প্রধান সাহিত্যিকসকলর বিরোধিতাত সেই প্রস্তাবো ফুটুকার ফেন হৈ উরি গ'ল।"

'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদর এই সদর্থক ভূমিকার বিষয়ে রত্নকান্ত বরকাকতীয়েও লিখিছে—

"১৯১৫ খৃষ্টাব্দর জুলাই মাহত মই কটন কলেজর প্রথম বার্ষিকত ভর্ত্তি হওঁ। তার অলপ আগতে কটন কলেজর সংস্কৃতর প্রফেছর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়র অনুগ্রহত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দত বর্দ্ধমানর বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনলৈ ময়ো হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু সর্বেশ্বর কটকীরে সৈতে 'হাফ কনচেছন' টিকতত ডেলিগে'ট হিচাবে যাবলৈ সুবিধা পাওঁ। সেই বর্দ্ধমান সাহিত্য সন্মিলন দর্শনর ফলতে মই, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু অম্বিকা রায়চৌধুরী— এই তিনিজনর যুটীয়া যত্নর ফলতে অসম সাহিত্য

সম্মিলনরো জন্ম হ'ল বুলিব লাগে। আমার কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরত পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বত ১৯১৭ চনত ভূমিষ্ঠ হ'ল।" (রত্নকান্ত বরকাকতী গদ্যসম্ভার— আত্মবাণী)[৩৩]

(পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কৃত সমালোচনার পর আজ পর্যন্ত একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব দেখা যায় — সত্যিই তেমন ছিলেন নাকি তিনি? কিন্তু পদ্মনাথের অন্য একটা দিকও বোধহয় সামান্য হলেও অবহেলিত। 'কামরূপশাসনাবলী'র প্রণেতা পদ্মনাথ যে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন — সে-কথা বিভিন্ন অসমিয়া বরেণ্য সাহিত্যিক লিখে রেখে গেছেন। অতুলচন্দ্র বরুয়া প্রণীত 'শরৎচন্দ্র গোস্বামী' নামক জীবনীগ্রন্থে এইরকম তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজরিকা 'অসম সাহিত্য সভার রূপরেখা' (পৃষ্ঠা ১৪) গ্রন্থে 'অসম সাহিত্য সভা স্থাপনর পূর্বরঙ্গ' অধ্যায়ে লিখেছেন :

"সেই উপলক্ষে যোরহাটে উপস্থিত অসমের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিষ্ণুরাম হল-এ সমবেত হয়ে একটি অসমিয়া সাহিত্য সভা ... স্থাপনের জন্য কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। মেঘের গর্জনই সার, বর্ষণ আর হল না। ওই বছরই গুয়াহাটির অ: ভা: উ: সা: [অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী] সভার এক বৈঠকে অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'অসম সাহিত্য সম্মিলন' গঠন করে সেখান থেকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন'-এ প্রতিনিধি পাঠানোর এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে, মূলত প্রধান সাহিত্যিকদের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাবও বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গেল।

"পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের এই সদর্থক ভূমিকা প্রসঙ্গে রত্নকান্ত বরকাকতীও লিখেছেন —

"১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমি কটন কলেজের প্রথম বর্ষে ভরতি হই। এর কিছুদিন আগে কটন কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুগ্রহে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে আমিও হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং সর্বেশ্বর কটকীর সঙ্গে 'হাফ কনসেশন' টিকিটে ডেলিগেট হিসাবে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিলাম। সেই বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলন দেখার ফলেই আমি, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী — এই তিনজনের সম্মিলিত চেষ্টায় অসম সাহিত্য সম্মেলন-এর জন্ম হল বলা যায়। আমাদের কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বে ১৯১৭ সালে ভূমিষ্ঠ হল।")

॥ দশ ॥

'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' প্রকৃতপক্ষে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মানস-সন্তান এবং তিনিই সেই নমস্য ব্যক্তি যিনি সর্বাগ্রে অসমে এ-রকম একটা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এবং সেই অনুসারে তিনি 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর পঞ্চম অধিবেশন দেবীতীর্থ কামাখ্যায় অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করেন। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ৭-৮ এপ্রিল (২৪-২৫ চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'-র জন্ম। পদ্মনাথ সেই সমিতির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন। মোট বারোজন সদস্যকে নিয়ে প্রথম 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হয়। এর মধ্যে ধীরেশ্বরাচার্য, পদ্মনাথ, হেমচন্দ্র গোস্বামী, কালীচরণ সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ দে প্রমুখ ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী সময়ে এই সমিতি বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গুয়াহাটি শাখার বড় কোনো পদে পদ্মনাথকে আমরা দেখিনি।

১৯০৫ থেকে ১৯২৩—এই সময়সীমা হচ্ছে কটন কলেজে পদ্মনাথের কর্মজীবন তথা গুয়াহাটিবাস। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি থেকে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পদ্মনাথ অসমের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এ-ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত গবেষণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই মূলত মনোনিবেশ করেছিলেন। আমাদের অনুমান, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার তীব্র সমালোচনার পর অসমিয়া সমাজে পদ্মনাথের অবস্থানটি ক্রমশ টলতে থাকে। পদ্মনাথও নিজেকে গুটিয়ে নেন। ১৯১৭-তে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা হলে অসমিয়া জাতীয়তাবাদী ধারাটির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু অসমকেন্দ্রিক এত বড় মাপের গবেষকের সেখানে কোনো বিশেষ স্থান ছিল না। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'জনশক্তি' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ) 'কি দুঃখে আসাম থাকিব?' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন পদ্মনাথ। নাম থেকেই বিষয় অনুমেয়।

১৯২৩-এর ৫ সেপ্টেম্বর পদ্মনাথ চাকরি-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার আগেকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য স্মর্তব্য।

ক. ১৯১২-তে তিনি দরবার মেডেল দ্বারা সম্মানিত হন এবং কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর অধিবেশনে বিশেষ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

খ. ১৯১২-র জানুআরিতে ঢাকা সারস্বত সমাজ-এর বিশাল অধিবেশনে তিনি অসমিয়া পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দেন।[৩৪]

গ. ১৯২২-এ তিনি 'মহাহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

পদ্মনাথ গুয়াহাটি থাকাকালীনই ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ অসম-ভ্রমণে এসে এই শহরে তিন-তিনটি দিন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও অংশগ্রহণ করেন। এমন-কি পদ্মনাথের হাতে-গড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গুয়াহাটি শাখা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন, কটন কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন, কিন্তু পদ্মনাথ কোনো কিছুতেই উপস্থিত ছিলেন না। বিষয়টি আশ্চর্যের, যদিও ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর 'নীল-সোনালির বাণী'-তে জানিয়েছেন : বরাবর রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও দর্শনের বিপরীতে ছিল পদ্মনাথের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর উদ্যোগে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হল-এ যে-সংবর্ধনার (২৮ জানুআরি ১৯১২) আয়োজন করা হয়, সেই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে পরিষদকে চিঠি লিখেছিলেন পদ্মনাথ। এ-ছাড়াও 'স্যার রবীন্দ্রনাথ বনাম চিত্তরঞ্জন', 'রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস' ইত্যাদি রচনায় শাণিত সমালোচনা করেছিলেন পদ্মনাথ।[৩৫]

॥ এগারো ॥

চাকরি থেকে অবসরের পরে পদ্মনাথ সপরিবারে কাশীধামে বসবাস শুরু করেন। পদ্মনাথের পারিবারিক দুই-একটি তথ্য দিই। তাঁর প্রথম পত্নী চন্দ্রপ্রভার অকালমৃত্যু হলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বসন্তকুমারীকে (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। ১৯৩৫-এ বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পরে তিনি কাশীধাম ছেড়ে জন্ম-গ্রাম বানিয়াচঙে পাকাপাকি চলে আসেন। ১৯৩৮-এর ৩০ অক্টোবর বেলা ৪টায় এখানেই তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

পদ্মনাথের এই প্রবাসযাত্রা বিষয়টি আমাদের খুব বিস্মিত করে। কেননা যে-মানুষটি ইচ্ছে করলেই কলকাতা বা ঢাকায় তাঁর অবশিষ্ট সারস্বত-জীবন কাটাতে পারতেন তিনি সুদূরে পাড়ি দিলেন কেন? এমন-কি গুয়াহাটিও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

এর দুটি কারণ আমরা অনুমান করি। প্রথমত, পদ্মনাথ অত্যন্ত স্বাভিমানী ছিলেন, এই অভিমান তাঁকে নিজের মতো করে চলতে শিখিয়েছে। বিদ্যাচর্চা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেননি। তিনি যা সত্য বলে মনে করেছেন তা-ই গ্রহণ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন।[৩৬] যেমন—

১. ১৯২৩-এ কোচবিহারের রাজশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

২. ১৯২৪-এ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদ-এর বার্ষিক সভার সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি।

৩. ১৯২৪-এ আসাম শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান।

৪. ১৯২৫-এ বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর দর্শন শাখার সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান।

৫. ১৯২৭-এ আসাম সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অস্বীকার।

৬. ১৯২৮-এ আবার আসাম সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অস্বীকার।

৭. ১৯২৮-এ ত্রিপুরার রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

৮. ১৯২৮-এ মথুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পদ প্রত্যাখ্যান।

৯. অখিল ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ প্রত্যাখ্যান।

সামগ্রিকভাবে পদ্মনাথ অসমের জন্য অনেক করেও সেভাবে স্বীকৃতি পাননি, বরং সমালোচনায় জেরবার হয়েছিলেন। অসম ছেড়ে যাওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে হয়।

এই তো গেল এক দিক। দ্বিতীয় দিকটি হল, পদ্মনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে তা রক্ষণশীলতার পরিচয়ও বহন করত। বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র হাজরিকা পদ্মনাথের সরাসরি ছাত্র ছিলেন কটন কলেজে। পদ্মনাথকে ছাত্ররা যে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সমীহ করত তা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। পদ্মনাথ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"এই মানুগরাকী আছিল খোনা, বিদগ্ধ পণ্ডিত, নিকপকপীয়া সনাতনী আরু নমো নমো পারিজাত। পরাপক্ষত তেওঁ তথাকথিত মেলেছবিলাকক জ্ঞাতসারে স্পর্শ নকরিছিল আরু কলেজর পরা গৈ গা-মুর তিয়াই আরু সম্ভবতঃ তার লগে লগে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করি গাটো শুচি করি লৈছিল। ...বিদ্যাবিনোদে হেনো জামাতুল্লার দোকানর পরা পাওরুটি খোয়ার বাবে নিজর

পুতেককো ত্যাজ্য পুত্র করিছিল আরু পুতেকর এনে অধরমী কার্যত লাই দিয়ার বাবে ঘৈণীয়েক ল'রার মাককো ঘরর পরা বাহির উলিয়াই দি উগ্রশাস্তি বিহিছিল। সেয়ে হলেও মানুহজন আছিল সাত্ত্বিক, বিদ্বান, ছাত্রবৎসল আরু স্বদেশানুরাগী।"[৩৭]

(মানুষটি ছিলেন তোতলা, বিদগ্ধ পণ্ডিত, গোঁড়া সনাতনী এবং শুচিগ্রস্ত। পারতপক্ষে তিনি তথাকথিত ম্লেচ্ছদের জ্ঞাতসারে স্পর্শ করতেন না এবং কলেজ থেকে গিয়ে গা-মাথা ধুয়ে আর সম্ভবত তার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করে শরীরটা শুচি করে নিতেন।... বিদ্যাবিনোদ নাকি জামাতুল্লার দোকান থেকে পাউরুটি খাওয়ার জন্য নিজের পুত্রকেও ত্যাজ্য-পুত্র করেছিলেন এবং পুত্রের এ-হেন অধর্মীয় কর্মকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য পত্নীকেও ঘর থেকে বের করে উগ্র শাস্তি দিয়েছিলেন। এ-সব সত্ত্বেও মানুষটি ছিলেন সাত্ত্বিক, বিদ্বান, ছাত্রবৎসল এবং স্বদেশানুরাগী।)

এ-সব হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু পদ্মনাথ যে তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন তা এ-জাতীয় তথ্য থেকে প্রমাণিত। সুতরাং একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে মহাতীর্থ কাশীতে ধর্মাচরণের উপযুক্ত পরিবেশ পাবেন মনে করেই তিনি সব ছেড়ে কাশীবাসী হন। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্র হিসাবেও কাশীকে তাঁর মনে ধরেছিল। তা ছাড়া পদ্মনাথ অবসর যাপনকালে নীরবে অধ্যয়ন-গবেষণাও চালিয়েছিলেন। তাঁর রচিত অসম ইতিহাসের মহৎ গ্রন্থ 'কামরূপশাসনাবলী' কাশী থাকাকালীন প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে-'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' তাঁর মানস-সন্তান স্বরূপ এবং যে-সমিতির পক্ষে তিনি এই গবেষণা-কর্মটি করেছিলেন, সেই সমিতি কিন্তু বইটি প্রকাশ করেনি। করেছিল 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'। 'কামরূপশাসনাবলী'-র ভূমিকায় তাই পদ্মনাথ খানিকটা আক্ষেপের সুরেই লিখেছেন—

"...যে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'র পক্ষ থেকে শাসনাবলী সঙ্কলিত করিতে প্রবৃত্ত হই; পরন্তু ঐ সমিতি কোনও কারণে স্বয়ং ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।"[৩৮]

কিন্তু কেন? লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আক্রমণের পরবর্তী রেশ? আমরা জানি না।

॥ বারো ॥

পদ্মনাথ বিভিন্ন সংস্কার কর্ম তথা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার দু-একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি।

১. পদ্মনাথের সম্পাদনায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' দ্বারা 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি এবং হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণদানবিধি' প্রকাশিত হয়।
২. ওই বছরই অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গ্রন্থের অন্তরালে পদ্মনাথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি তখনকার দিনে ৪,৫০০ টাকা ব্যয় করে সেটি প্রকাশও করেন।
৩. আমার পিতামহ প্রয়াত কীর্তিচরণ গিরির সংগ্রহ থেকে পদ্যে রচিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' নামে একটি খণ্ডিত গ্রন্থ পেয়েছি। লেখক—শ্রীহট্টের রমেশচন্দ্র দেবশর্মা। এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও পদ্মনাথ অর্থ ব্যয় করেছিলেন।
৪. ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে, বিশেষত বানিয়াচঙে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ত্রাণে পদ্মনাথ মুক্তহস্তে দান করেন।
৫. তখন শ্রীহট্টে 'খাটেধরা' নামে এক প্রথা ছিল। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন—

   'অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীহট্ট জেলায়, বিশেষত সুপ্রাচীন বানিয়াচঙ্গ গ্রামে বিবাহবাসরে কাষ্ঠাসনে উঠাইয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ সম্পাদনের প্রথা ছিল। ইহাই গ্রাম্য ভাষায় খাটেধরা নামে অভিহিত। বরের খাটে চারিজন ও কন্যার খাটে চারিজনে ধরার নিয়ম ছিল এবং এই কার্য্য একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হইত যাহারা সমাজে স্বভাবতই হেয় বলিয়া গণ্য হইত...।'[৩৯] পদ্মনাথ এই প্রথা বিলোপ করেন। এ-জন্য তাঁকে বহু প্রতিকূলতাও সহ্য করতে হয়েছে।
৫. পদ্মনাথ অত্যন্ত ছাত্র-বৎসল ছিলেন। গরিব দুস্থ ছাত্রদের জন্য সারা জীবন অকাতরে অর্থ দান করে গেছেন।

আক্ষেপের বিষয়, অসমের ইতিহাস থেকে এই রকম একজন কর্মযোগী পণ্ডিতের অবদান প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। তাঁকে আর তেমনভাবে স্মরণই করা হয় না। এমন-কি কয়েক বছর আগে, ২০০১-এ, কটন কলেজের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। পদ্মনাথের নামে কটন কলেজের কোনো একটি ভবন উৎসর্গ

করা যেত; করা হয়নি। পদ্মনাথ আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম!

তবুও সুখের কথা, পদ্মনাথের উত্তরপুরুষ কবি রমানাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবার এই মহান পণ্ডিতকে আবার আলোর বৃত্তে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের সাধুবাদ জানাই।❑

তথ্যসূত্র :

১. **'The Journal of the Assam Research Society'**, Vol-I, No.-I. April 1933. Edited by Kanaklal Baruah. 'Introduction'.

২. **'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য'**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৫, পৃ. ৫।

৩. তদেব। পৃ. ৬।

৪. **'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস'**, মদনমোহন কুমার, সম্পাদক, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, পৃ. ১৫৮।

৫. মুখবন্ধ, **'প্রবন্ধাষ্টক'**, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৬. **'শোকসিন্ধু'**, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯, ২৫ ফেব্রুআরি। পৃ. ১৫।

৭. **'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য'**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। পৃ. ৯।

৮. **'শোকসিন্ধু'**, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃ. ১৫-১৬।

৯. **History of Services of Gazetted and other Officers serving under the Government of Assam.** Corrected to 1st July, 1923. Page 293.

১০. **'বিবেকানন্দ চরিত'**, সত্যেন্দ্রনাথ মজুদার, চতুর্থ সং, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ.৫০৫।

১১. **'আসামে বিবেকানন্দ'**, পুনর্মুদ্রণ, 'একা এবং কয়েকজন', ১৪০৬, পৃ. ১৮।

১২. *"এবার স্বামী বিবেকানন্দ গুয়াহাটীলৈ অহাত, চহরবাসী ভদ্রলোকসকলে তেওঁক অভ্যর্থনা করিবলৈ এখন সভা পাতিছিল। সেই সভাত আমার পূজ্যপাদ কবিরত্ন-দেবো উপস্থিত আছিল। স্বামীজীয়ে সভাত বক্তৃতা দিলত, আমার আচার্যদেবে হঠাৎ থিয় দি স্বামীজীর সংস্কৃত কথাত দুটা নে এটা ভুল ধরিলে। দেউর তেনেকুয়া মূর্ত্তি দেখি, ভদ্রলোকসকলে দেউক বহিবলৈ অনুরোধ করিলত, স্বামীজীয়েও ভুলটো স্বীকার করি কলে যে,— 'তেওঁর সংস্কৃত কোয়া অভ্যাস বেচি নাই।' "* (একবার স্বামী বিবেকানন্দের গুয়াহাটি আগমন উপলক্ষে শহরবাসী ভদ্রলোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজি সভায় বক্তৃতারত অবস্থায় আমাদের আচার্যদেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় একটি বা দুটি ভুল ধরলেন। কবিরত্নদেবের এমন মূর্তি দেখে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তাঁকে বসার অনুরোধ জানালেন। স্বামীজিও ভুলটি স্বীকার করে বললেন যে— তাঁর সংস্কৃত বলার অভ্যাস বেশি নেই।) —'মহামহোপাধ্যায় ঁধীরেশ্বরাচার্য্য— কবিরত্নদেবর জীবনচরিত', কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য ব্যাকরণশাস্ত্রী, প্রথম সং ১৯২৮, পৃ. ৫৫। [পদ্মনাথের লেখায় ঘটনাটি আছে, তবে স্বামীজির ভুল ধীরেশ্বরাচার্য ধরেছিলেন—এমন তথ্য নেই।]

১৩. **'আসামে বিবেকানন্দ'**, পুনর্মুদ্রণ, 'একা এবং কয়েকজন', ১৪০৬, পৃ. ২১।

১৪. সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৫০৬।

১৫. **মঞ্চলেখা**, অতুলচন্দ্র হাজরিকা। প্রথম সং ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৩।

১৬. তথ্যটি মহেন্দ্রমোহনের নাতি প্রয়াত আইনজীবী নীরেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর কাছ থেকে পাওয়া।

১৭. **ইতিহাসর ছাঁ-পোহরত পুরণি গুয়াহাটী**, কুমুদেশ্বর হাজরিকা, পৃ. ৩০-৩১।

১৮. **'ধীরেশ্বরাচার্যর জীবনচরিত'**, পৃ. ৪৯-৫০।

১৯. **তদেব**, পৃ. ৭১।

২০. **অসমীয়া সাহিত্যর পরমাচার্য্য পণ্ডিত গোস্বামী**, বেণুধর শর্মা। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২, পৃ. ৫০।

২১. **মোর জীবন-সোঁঅরণ**, দ্বিতীয় সং, পৃ. ৪৪।

২২. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', প্রথমভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪-৯৭।

২৩. *'পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ'*, পুনর্মুদ্রণ, **'প্রবন্ধাষ্টক'**, পৃ. ৯৬-৯৭।

২৪. **Men I have met** by S. K. Bhuyan. 1st Edition 1962, P. 25-26।

২৫. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', প্রথম ভাগ, পৃ. ১০১।
২৬. ভূমিকা, **কামরূপশাসনাবলী**, প্রথম সং, ১৯৩১।
২৭. **তদেব**।
২৮. **পরিষদ-পরিচয়**, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৬ কার্তিক, সংকলক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭।
২৯. এখানে 'আর্যনাট্য সমাজ'-এর কথা বলা হচ্ছে।
৩০. **'The Bengalee'**; Calcatta, January 21, 1910 A.D. Vol-LI, No. 19।
৩১. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', প্রথমভাগ, পৃ. ১৪-১৫।
৩২. **তদেব**, পৃ. ৬১-৬২।
৩৩. **সাতসরী**, রাগ-অনুরাগ-১, বিশেষ সংখ্যা। ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ.২০।
৩৪. **ধীরেশ্বরাচার্যর জীবনচরিত**, পৃ.৯৩।
৩৫. **নীল-সোনালির বাণী**, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৫৬-৫৮।
৩৬. **পদ্মনাথ ভট্টাচার্য**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ১৬।
৩৭. **স্মৃতির পাপরি**, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৪৭।
৩৮. ভূমিকা, **কামরূপশাসনাবলী**, প্রথম সং, ১৯৩১।
৩৯. '**শোকসিন্ধু**', শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ২১।

পরিশিষ্ট

অসম-বিষয়ক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের কিছু রচনা—

১. *পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ*। 'আরতি', (১৩১৪ বৈশাখ)।
২. *অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*। 'আসাম বান্ধব', ১ম বর্ষ।
৩. *কামরূপশাসনাবলী : ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন*। 'কার্যবিবরণী; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', (১৯২০ খ্রি.)
৪. *শ্রীহট্টে পণ্ডিতা রামাবাই*। 'কমলা', (১৩১১ পৌষ)।
৫. *গোপালকৃষ্ণ দে*। 'কমলা', (১৩৩২ ভাদ্র)।
৬. *কামরূপ রাজাবলী*। 'কমলা', (১৩৩২ অগ্রহায়ণ-পৌষ)।
৭. *কি দুঃখে আসাম থাকিব?* 'জনশক্তি', (১৩৩৫ অগ্রহায়ণ)।
৮. *মহাপুরুষীয়া সম্পদায়*। 'ঢাকা রিভিউ', (১৩১৮ আষাঢ়)।
৯. *ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন—ভাস্কর বর্মার নষ্টকল্পনা*। 'নবযুগ', (১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ)।
১০. *আসামে বঙ্গ সাহিত্য চর্চা*। 'নব্যভারত', (১৩২৬ ফাল্গুন)।
১১. *কামরূপে কোচরাজ কীর্তি*। 'পরিচারিকা', (১৩২৮ আশ্বিন)।
১২. *গোসাই ও ভকত*। 'প্রতিভা', (১৩২০ জ্যৈষ্ঠ)।
১৩. *আহোম আকবর রুদ্রসিংহ*। 'প্রতিভা' (১৩২১ পৌষ)।
১৪. *আসাম রাজের বাঙ্গালী গুরু*। 'প্রতিভা', (১৩২৩ ভাদ্র)।
১৫. *ভাস্কর বর্মা ও ভিনসেন্ট স্মিথ*। 'প্রতিভা', (১৩২৮ অগ্রহায়ণ)।
১৬. *বল্লভদেবের তাম্রশাসন*। 'প্রতিভা', (১৩৩৩ শ্রাবণ-চৈত্র)।
১৭. *হর্জ্জরদেবের তেজপুরস্থ পাষাণ গাত্র লিপি*। 'প্রতিভা', (১৩৩৪ কার্তিক-চৈত্র)।
১৮. *হর্জ্জরদেবের তাম্রশাসনের মধ্য ফলক*। 'প্রতিভা', (১৩৩৫ বৈশাখ-চৈত্র)।
১৯. *পরশুরাম কুণ্ড*। 'বঙ্গবাসী', (১৩৩০ পৌষ)।
২০. *কাছাড়ের বিক্রমপুর*। 'বিক্রমপুর', (১৩২৪ বৈশাখ)।
২১. *আসামে বিবেকানন্দ*। 'মর্যাদা' (হিন্দি) (...)।
২২. *অসমীয়া ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৭)।
২৩. *অসমীয়া গ্রন্থবিবরণী*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৮)।
২৪. *ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৯)।
২৫. *বনমালদেবের তাম্রশাসন*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩২১)।

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস-এর জীবন ও সাহিত্য

শ্যামসুন্দর বসু

এক বিস্ময়কর কিংবদন্তিপ্রতিম ভূপর্যটকের নাম রামনাথ বিশ্বাস। কর্মকে যোগ হিসেবে গ্রহণ করে দুর্দমনীয় জিদ্দিবাজ রামনাথ সেই সময় দুই বাংলার মানুষের হৃদয়ে তুলেছিলেন ঝোড়ো উন্মাদনা। আমাদের 'ভেতো বাঙালি' বা 'ঘরকুনো' অপবাদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে প্রায় অন্ধকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে দুঃসাহসী বাঙালি বীর সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ (১৯৩১-১৯৪০) করেছিলেন— চেয়েছিলেন, পৃথিবী ও তার হাজারো রকম মানুষের সঙ্গে 'জান পহচান' করে জানিয়ে যাবেন নিজের দেশের মানুষকে; বিশেষ করে টগবগে উৎসাহ জোগাবেন যুবসমাজকে। মনে রাখতে হবে, তিনি যাত্রা শুরুই করেছিলেন কোনোরকম টাকাপয়সা সঙ্গে না-নিয়ে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে। যা আজকের 'স্পনসরসিপ'-এর যুগে ভাবাই যায় না। এমন দাপুটে হিম্মত 'কোটিকে গুটিক' হয় বলেই-না তিনি চিরস্মরণীয়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে দার্শনিক বেজহট-এর অবিস্মরণীয় উক্তি— "The greatest pleasure in life lies in doing what people say you cannot do." সেই কাজটি করেই পাওয়া যায় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, যেটার জন্য সাধারণ মানুষ বলে, এটা করা সম্ভব নয়।

এ-হেন মহান মানুষটির জন্ম ২৩শে চৈত্র, রবিবার, বাংলা ১৩০০ সালে। বাবা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। বিদ্যাভূষণ পাড়া। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। বয়স পাঁচ পেরিয়ে গেল, অথচ লেখাপড়া শুরুই হল না। দেখতে দেখতে আটের দরজায় পৌঁছে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। বাবা-মা দুজনেই ক্রমে ক্রমে মারা গেছেন। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ

মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

ব্যতিক্রমধর্মী মানুষেরা সমাজের বহমান ফাঁকিগুলি কেমন যেন সহজাত গুণে ধরে ফেলেন। রামনাথও এগুলি শনাক্ত করে ফেলতেন অতি সহজেই। ধর্মের আড়ালেই হোক কিংবা শাসনের বেড়াজালেই ঘটুক, মানুষের প্রতি কোনোরকমের বঞ্চনা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যেন খাপখোলা এক ঝকমকে তলোয়ার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়েই যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সুশীল সেনের শাখায়। রামনাথকে পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সেই শাখা, আপন স্বাতন্ত্র্যে। এই সময় ইংরেজ সরকার একটি আইনের বলে পতিত জমির ওপর খাজনা ধার্য করলে রামনাথ গ্রামের সবাইকে একজোট করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত রায় গ্রামবাসীদের পক্ষে গেলে 'রামা'র জয়জয়কার পড়ে যায়। এরপর শুরু হয় স্কুলে স্কুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র ধর্মঘট, যার নেতৃত্বে ছিলেন রামনাথ।

১৯১৪ সালে শুরু হল রামনাথের বিচিত্র এক জীবন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যে বাঙালি পল্টন ও লেবার কোর গঠন করা হয়, তাতে তিনি যোগ দেন অফিসের বড়বাবু হিসেবে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে, শরীরের ওজন নিয়ম অনুযায়ী ১০০ পাউন্ডের কম হয়ে যাওয়ায়, 'জিসচার্জড' হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। অথচ চুপচাপ বসে থাকা তাঁর ধাতে ছিল না। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনা বিভাগের জন্য কেরানি ও অফিসার স্কুলের ট্রেনিং-এ যোগ দেন 'কুমটি'তে। ১৯১৮ থেকে শুরু তাঁর পরোক্ষ পর্যটন। কেননা ট্রেনিঙের পর সেনা জীবনের চাকরির সুবাদে সুদূর আফগানিস্তান, পারস্য ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত ঘুরতে হয়েছিল। তবে এই চাকরির কঠোর নিয়ানুবর্তিতার চাপে পড়ে মুক্ত বিহঙ্গ রামনাথ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ায় কাহিল হয়ে চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাহলেও এমন মানুষটির কাছে সে আর ক-দিন? বাইরের ডাক যাঁর অন্তরে বেজে চলে ঘড়ির কাঁটার মতো টিক্‌টিক করে, তাঁকে কি ঘরে বেঁধে রাখা যায়! বের হতেই হবে ঠিকঠিক। এ-ছাড়া সংসারের দায়দায়িত্বও কিছুটা তো চেপেছে ঘাড়ে। কোনোরকমে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়লেন, সেই বছরেই মালয় দেশের সিঙ্গাপুরে কাজ নিলেন জাহাজি আদালতে ত্রিভাষী (ইংরেজি-চিনা-মালয়) সুপারভাইজার হিসেবে।

সিঙ্গাপুরে চাকরি রামনাথের জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। এমনিতেই রামনাথের মন ছিল বিপ্লবী তারে বাঁধা। তার ওপরে বাসায় গৌরীশ চন্দ্র সিংহরায়-এর মতো বিপ্লবীরা একে একে আসা-যাওয়া শুরু করেন। এঁরা ছিলেন পাঞ্জাবের যতীন চাটুজ্যের 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর 'আন্ডারগ্রাউন্ড' সদস্য। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গেও ছিল এঁদের যোগাযোগ। গৌরীশচন্দ্র ১৯২৬ সাল থেকেই রামনাথকে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়তে উৎসাহিত করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভূপর্যটনের পথে-পথে রামনাথ যেন পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী দলের রাষ্ট্রদূত রূপে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন। অজয় নামে গৌরীশের এক শাকরেদ পুলিশকে খবর দিয়ে এল— রামবাবু হেন-তেন ভাবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। ব্যস, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও অর্থসাহায্য করার অপরাধে চাকরি চলে গেল। মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকল সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের। কিন্তু নতুন লোক না-পাওয়া পর্যন্ত এক মাস অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এর পর তিন মাস পুরো বেতনে ছুটি কাটিয়ে তবে মুক্তি। রেজিগনেশন জমা দেওয়ার দিন কুড়ি পর, একদিন বেলা এগারোটায় অন ডিউটিতে দেখেন, মেরিন কোর্টের কাঠগড়ায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্পেনের দুই যুবক। বিনা টিকিটে ও বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হেলায় বললেন— "আমাদের পয়সা নেই যে টিকিট কেটে পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারি। স্থলপথে না-হয় হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু জলপথে অন্য উপায় কী? আর পাসপোর্ট আমরা পাই না এ-জন্য যে, আমরা সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু ভ্রমণের অধিকার তো মানুষের জন্মগত। পৃথিবী ভ্রমণ না-করলে এ-জন্মই নিরর্থক।" যেটুকু-বা উৎসাহ-উদ্দীপনার বাকি ছিল, এই চাক্ষুষ ঘটনার পর তা বেড়ে গেল দাউদাউ তেজে।

৭ জুলাই ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ। যাত্রা শুরু সিঙ্গাপুরের কুইন স্ট্রিটের বাঙালি মসজিদ থেকে, দুপুর দুটোয়। বেলা একটার

সময় কুইন স্ট্রিটে গিয়ে উপস্থিত হলেন একটি সাইকেল নিয়ে। সঙ্গে একটি খদ্দরের চাদর আর মশারি। পোশাক একটা, যেটা পরে আছেন। টাকাকড়ি সঙ্গে কিছুই নিলেন না। সত্যিই পাসপোর্ট ছাড়া সেদিন তাঁর সম্বল ছিল শুধুই দৃপ্ত সংকল্প এবং অনমনীয় মনোবল। অজস্র মানুষের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে চাকা দুটি চালিয়ে দিলেন পৃথিবীর পথে।

প্রথমে এলেন মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুরে। ক্রমে জিত্রা, চিয়াংলুং-এর ধুলো উড়িয়ে শ্যামল মাটির শ্যামদেশে অর্থাৎ তাইল্যান্ডে। সেখান থেকে ইন্দোচিন ও চিনে। হংকং-ক্যান্টন-নানকিন-সাংহাই হয়ে পিকিং (বর্তমান বেজিং)। দু-চাকায় চলার পথে তাঁর সবচাইতে প্রিয় দেশ চিন। তিন-তিনবার ঘুরেফিরে এসেছেন। মনে রাখতে হবে— জীবনের শুরু থেকে তিনি আস্তিক হলেও ভ্রমণের মধ্যগগনে মাও-সে-তুঙের আগুনখেকো প্রভাবে হয়ে ওঠেন রীতিমতো নাস্তিক। পিকিং ঘুরে মাঞ্চুকো, মুকদেন ও সীমান্তশহর আন্তং হয়ে ঢুকে পড়লেন কোরিয়ায়। তারপর জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে পৌঁছলেন। জাপান পরিক্রমা শেষ করে অতলান্তিক পেরিয়ে আমেরিকায় যেতে চাইলেন তিনি। বাধা পেলেন কানাডায়। ইমিগ্রেশন বিভাগ তাঁকে বন্দি করে জেলে পাঠাল। কেননা ও-দেশের তখন নিয়ম, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলে তবে কানাডায় থাকা ও ঘোরার অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু ভবঘুরের পকেট যে তখন গড়ের মাঠ। তাই শাস্তি হিসেবে থাকতে হল ভারকোডার জেলে ২৯ দিন। কানাডা সরকার ৩০ দিনের দিন 'হিয়েমারু' নামে একটি জাপানি জাহাজে করে তাঁকে পাঠিয়ে দেয় জাপানে। কিন্তু জাপান বন্দরও তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়নি। চারদিন পর তাঁকে ঠেলে দেওয়া হয় চিনের বন্দর সাংহাইতে।

অসম্ভব জেদ ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যাঁর মূলধন, আমেরিকা বা জাপান সরকার সেই রামনাথকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি বেশিদিন। পরবর্তীকালে সময়-সুযোগ মতো সে-দেশগুলির সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং দেখেছেন তন্নতন্ন করে। আপন প্রজ্ঞার আলোকে করে গেছেন অন্তর্তদন্ত।

জাপান বন্দরে বাধা পেয়ে ঝটিতি আবার চিনের কিছু অংশ ঘুরে নিয়ে পাড়ি জমালেন ফিলিপাইন, বালি, সুরাবায়া, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে। তাঁর একরোখা মনোভাবের জন্য জাভার ডাচ সরকার তাঁকে বন্দি করে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেয়। একমাস পরে সিঙ্গাপুর থেকে পিনাং ছুঁয়ে মারগুঁই বন্দর হয়ে ঢোকেন বর্মা (মায়ানমার) মুলুকে। এরপর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চল দেখে চলে যান আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন হয়ে তুরস্কে।

তুরস্কের পর ইউরোপ মহাদেশ, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। সীমাহীন কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে এক-একটি দেশ অতিক্রম করেছেন আর তিল তিল করে উপলব্ধি করেছেন যুদ্ধজয়ের অনুভূতি ও অন্তর্লীন আনন্দ।

এর পর ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে পৌঁছলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু শেষ সম্বল কয়েকটি মাত্র পেনি জলখাবার খেতেই শেষ হয়ে যায়। ওদিকে ইস্ট এন্ডে ঘর ভাড়া করে ফেলেছেন। পরপর দু'দিন অভুক্ত। বিশ্ব পর্যটনে এমনটি হয়েছে তাঁর বারবার। এ-যাত্রায় সিলেটের এক ভদ্রলোকের সাহায্যে রক্ষা পান কোনোক্রমে। অনেক সময় বিভিন্ন ভাষায় লেখা 'ট্যুর'পথের বিবরণ তথা সাহায্যপত্র দেখিয়ে মানুষের কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে এমনটি করতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন— "এ কাজ ছিল সাইকেল ভ্রমণ অপেক্ষা কঠিন।"

অতঃপর ব্রিটেন ও স্কটল্যান্ড ঘুরে আয়ার্ল্যান্ডে যাচ্ছেন। এমন সময় অমানুষিক পরিশ্রমের দরুন শরীর ভেঙে পড়ল। ঠিক করলেন, ভারতে ফিরে আসবেন। সাইকেল নিয়ে জাহাজে উঠে বসলেন।

কিন্তু মাত্র দু'মাস বিশ্রাম নিয়েই হাঁপিয়ে-ওঠা ভ্রামণিক আবার বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ব ভ্রমণের পাঞ্জা কষতে। এবার আফ্রিকা মহাদেশ। উত্তর আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, টাঙ্গানাইকা, নয়াসাল্যান্ড সহ রোডেশিয়া ছুঁয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল, নাটাল এবং কেপরাজ্য সফর করলেন।

এর পর গেলেন সেই বহুকাঙ্ক্ষিত দেশ আমেরিকায়। যেখানে গোড়ায় শুধু বাধা, অপমান আর তিরস্কার জুটেছিল। হয়তো-বা ছিল ভাবী পুরস্কারের ভিত্তিভূমি। দু'চোখ ভরে দেশটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন, তৃতীয় নেত্রের মেলবন্ধনে। লিখলেন সার্থকতম বই 'আজকের আমেরিকা'।

কোন্ সেই যুগে কল্পনাতীতভাবে নিজেকে নিংড়ে দিয়ে, তিন দফায় প্রায় ৮৭ হাজার মাইল পরিক্রমা করে, বিশ্বজোড়া অভিজ্ঞতার পরমানন্দ বুকে নিয়ে 'গ্লোবট্রটার'মশাই কলকাতায়

ফিরে থিতু হলেন ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। যেমন নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিলেন একদিন, ফিরেও এলেন তেমনই কপর্দকহীন অবস্থায়। যোগের খাতায় রইল শুধু মানুষের দেওয়া আখ্যা— ভূপর্যটক। চির-উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো।

মানুষ রামনাথও ওই ধ্রুবতারার মতোই প্রোজ্জ্বল। যেমন সৎ তেমনই আদর্শবাদী। ন্যায়-নীতি ছিল জীবনের অঙ্গ। ঘৃণা করতেন দ্বিচারিতা। সম্মান করতেন মাতৃজাতিকে। প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটাই ছিল তাঁর স্বভাব। অন্যায় দেখলেই তাঁর হাত-পা নিশপিশ করত, প্রতিবাদও করতেন সেভাবেই। প্রয়োজনে ঝলসে উঠতেন। ফুটে উঠত তাঁর তেজস্বিতা। আবার ঠিক উলটোদিকে, মানুষের প্রয়োজনে ও আপদে-বিপদে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন উজাড় করে। ছেচল্লিশের সেই ভয়ংকর দাঙ্গায় হিন্দুদের যেমন দু-হাত দিয়ে আগলেছেন, মুসলমানদেরও তেমনই সামলেছেন বুক দিয়ে। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরেটা আপাতকঠিন মনে হলেও, হৃদয়টি ছিল বড়ই কোমল। পরের দুঃখকে আপন করে নিতে এমন দিলখোলা মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ। ধর্মের গোঁড়ামি, কু-প্রথা, অন্ধ সংস্কার ও মানুষে-মানুষে বিভেদের বিরুদ্ধে বরাবরই তিনি সোচ্চার ও খড়্গহস্ত ছিলেন। খানিকটা জাপানির মতো দেখতে, গাঁট্টাগোট্টা এই দুঃসাহসী বাঙালি বীরের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ছিল যুবসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা। অলস কিংবা ভেঙে-পড়া যে-কোনো যুবকের মধ্যে জীবনীশক্তির বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিত করার মন্ত্র ছিল তাঁর অনায়াস করায়ত্ত। বাংলার যুবসমাজকে ভ্রমণ ও দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে বলতেন, "জগৎ ও জীবনকে হাতেকলমে যাচাইয়া দেখুন। বিদেশের সঞ্চয় আনিয়া দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করুন।" সত্যি বলতে-কি, তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই যৌবনের পূজারি।

অথচ, পথিকৃৎ এমন মহৎ মানুষটি যোগ্য স্বীকৃতি আর পেলেন কই? প্রাপ্তির খাতায়— জীবনের শেষ প্রান্তে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য কিছু সরকারি বৃত্তি আর মধ্য কলকাতায় শেয়ালদার কাছে তাঁর নামে একটি রাস্তা। হলওয়েল লেনের নাম বদলে রাখা হয়েছে 'রামনাথ বিশ্বাস লেন'।

আশ্চর্য মানুষ এই রামনাথ। বুদ্ধি, সাহস বা গায়ের জোর, কমতি ছিল না কোনোটারই। চিনে একবার ভয়ানক ডাকাতদের হাতে পড়লেও কিচ্ছুটি তারা কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি। বরং নিজেরাই তাঁকে কিছু দিয়ে গিয়েছিল। এ যে দেখি উলটো পুরাণ! পিকিং-এর পথে হোটেলে ঢুকতে গিয়ে দেখেন জাপানি এক চর একটি চিনা যুবককে চাবুক মারছে নির্দয়ভাবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন। চরটি রামনাথকে চাবুক মারতে গেলে তৎক্ষণাৎ সেটি কেড়ে নিয়ে তাকেই দু-চার ঘা বসিয়ে দিলেন। কখনো কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। সিঙ্গাপুর, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কেউ তাঁকে অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার মোক্ষম জবাব। যেন মূর্তিমান বিদ্রোহী।

অন্যদিকে, যে-দেশে গেছেন সেই দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর মন ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠত। আর্তজনদের জন্য কেঁদে উঠত তাঁর ব্যথিত হৃদয়। আফ্রিকায় রওনা হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, "দেখো রামনাথ, নিগ্রো চরিত্রে যা ভালো দেখবে তা-ই বয়ে নিয়ে আসবে।" কিন্তু নিদারুণ বঞ্চিত ও অত্যাচারিত নিগ্রোদের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি লিখেছিলেন— "নিগ্রো চরিত্রে কী আর ভাল দেখব? মনিব থেকে গোলাম পর্যন্ত সবাই নিগ্রো নির্যাতনে পরম উৎসুক।"

আফ্রিকায় জঙ্গলের পথে হাঁটছেন। সঙ্গে তিন জন নিগ্রো। হঠাৎ তাদেরই একজনের পায়ে বিষাক্ত কাঁটা ফুটল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতর আবেদন জানায়— "আমাদের ফেলে রেখে পালাবে না তো বাবু?" রামনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— "বলে দে তারু (বয়স্ক নিগ্রোটির নাম), আমি ইউরোপিয়ান নই, ভারতীয় ব্যবসায়ীও নই। আমি তোদের মতোই মানুষ। একে ফেলে আমি কোথাও যাব না।" এখানেই রামনাথ ব্যতিক্রমী। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পালিয়ে বাঁচার স্বার্থ দেখেননি। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর চরিত্রের বড় গুণ। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছিল প্রখর ব্যক্তিত্ব। আফ্রিকা ভ্রমণ শেষে জাহাজে চড়েছেন, বিলেত ঘুরে যাবেন আমেরিকায়। লক্ষ্য করে দেখলেন, জাহাজে সাদা চামড়ার লোকেরা ছাড়া অন্যরা ভয়ে কেমন যেন কেঁচো হয়ে আছেন। অথচ এশিয়ার লোকেদের মধ্যে সেই জাহাজে জাপানি ও তুর্কিদেরই দাপট। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন রামনাথ। এক সাহেব তাঁকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন— "তুই কি প্যাসেঞ্জার?" রামনাথের তুরন্ত জবাব— "হ্যাঁ রে,

তোর মতোই।" জাহাজের অন্য যাত্রীরা তারপর নির্ভয়ে চলাফেরা করতে লাগল।

ছেলেবেলা থেকেই দুঃসাহসী হওয়ার ফলে জীবনে যেমন অনেক বিপদ থেকে সহজে উদ্ধার পেয়েছেন, তেমনই আবার বিপদ ডেকেও এনেছেন বারবার। বেশ কয়েকটি দেশে পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। মারও খেয়েছেন অনেক বার। তিনি দেখতে ছিলেন কিছুটা জাপানিদের মতো। সাংহাই-এর পথে নিংপো গ্রামে একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, এক চিনা সৈনিক 'জাঁপ্পুন কুই' (জাপানি ভূত) বলে তাঁকে ঘুসি মারলে তিনিও পালটা এক মোক্ষম ঘুসি ঝাড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো একটা ব্যাটেলিয়ন এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে রামনাথ জ্ঞান হারান। সেবার সেরে উঠতে পুরো দু-মাস সময় লেগেছিল।

সুবিশাল অভিযাত্রায় মানবদরদি কতবার যে তাঁর পকেটের শেষ কপর্দকটি দিয়েও নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখাজোখা নেই। কত মানুষকে যে নীরবে গোপনে সাহায্য করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নিজের আর্থিক অনটনের মধ্যেও দেখা যেত, মানুষের দুঃসময়ে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঠোঙায় করে খাবার এনে কোনো-না-কোনো অভুক্ত মুখে তুলে দিচ্ছেন। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মনে রাখতে হবে, তিনি যে-সময় ভূপর্যটন করেছেন, সেই প্রায় অন্ধকার যুগে বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াতের পথ ছিল অতীব দুর্গম। তাঁকে যে সীমাহীন কষ্ট করে ঘুরতে হয়েছে তা প্রযুক্তিনির্ভর আজকের পৃথিবীতে বসে কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘরছাড়া সবরকম ছেলেমেয়ের কাছেই রামনাথ হতে পারেন যথার্থ পথিকৃৎ। তাঁর দেশ ছিল সারা বিশ্ব। পথের টানে তিনি ভবঘুরে হতে পেরেছিলেন বলেই পৃথিবীর সব দেশে পেয়েছিলেন প্রাণভরা আদর ও ভালোবাসা।

রামনাথের সাহিত্য

দু-চাকায় ভর করে ভুবন ভ্রমণকালে সীমাহীন ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন রামনাথ। সেইসঙ্গে চোখ দুটিকে করে নিয়েছিলেন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবিন। এরই লেন্সের মাধ্যমে যাবতীয় মানুষ ও বিষয়-ঘটনার অন্তস্তল পর্যন্ত এক লহমায় পড়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারতেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়। গড়িয়ে-যাওয়া সাইকেলের দুটি চাকা চোখের স্বচ্ছ দুটি লেন্সের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমুদ্রবিশাল ভাণ্ডার প্রকাশ পেয়েছে রামনাথের সাহিত্যে।

বিশ্বাসমশাই শুধু নিজেই ভূপর্যটন করেননি, সাহিত্যের মাধ্যমে অসংখ্য পাঠককে দুনিয়া ঘুরিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন তাঁর চোখ দিয়ে। নিজস্ব ঢঙে এবং নিজস্ব রঙে। এই সমস্ত বইয়ের সিংহভাগ ভ্রমণ বিষয়ক হলেও গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁর দক্ষতার আর-এক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই ভ্রমণ কাহিনি লিখতে থাকেন বিক্ষিপ্তভাবে। এই সময় বিভিন্ন পত্রিকার দরজায় দরজায় নানা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লেখাগুলি নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। অবশেষে সে-লেখা নিজস্ব পত্রিকায় স্থান দিয়ে প্রথম সম্মান দেন 'প্রবর্তক'-এর রাধারমণ চৌধুরী। পুরোধা প্রবর্তক-এর সূত্র ধরে যে-উৎসাহের সূচনা হল তা নবতর উদ্যমে বেড়ে চলে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাতে ভাটা পড়েনি। ক্রমে দেশ, বসুমতী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকায় ব্যাপক হারে লেখা বের হতে থাকে। সে-সময় বিশেষ করে মানসিক ভ্রমণপিপাসু বাঙালি পাঠক উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত তাঁর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখাগুলির জন্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। পর্যটনশেষে ১৯৪০ সালে কলকাতায় থিতু হয়েই মন দিলেন বই লেখায়। বয়স তখন সাতচল্লিশ। বিচ্ছিন্ন লেখাগুলি জড়ো করে বাড়তি কিছু সংযোজন ঘটিয়ে কলমের ডগায় আনলেন ঝড়ের গতি। সেই ঝোড়ো হওয়ায় পাল তুলে একে একে ভেসে এল ভ্রমণের বজরা, গল্পের নৌকা ও উপন্যাসের পানসি।

প্রকাশিত ভ্রমণের বইগুলি যথাক্রমে : ১) তরুণ তুর্কী (১৯৪১), মোট চারটি সংস্করণ বের হয়, মূল্য ২.০০ টাকা; ২) মরণবিজয়ী চীন (১৯৪১), তাঁর সবচাইতে প্রিয় বই, মূল্য ৬.০০ টাকা; ৩) Africa in Picture (১৯৪১); ৪) আজকের আমেরিকা (১৯৪১), তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় বই, ছয়টি সংস্করণই নিঃশেষিত হয়ে যায়, মূল্য ৩.৫০ টাকা; ৫) কোরিয়া ভ্রমণ (১৯৪২), মোট তিনটি সংস্করণ ছাপা হয়; ৬) আধুনিক ভূ-পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেক্সটবুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য লিখিত ভূগোল পাঠ্যপুস্তক। রামনাথ বিশ্বাস এবং হাওড়া মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোল

শিক্ষক বিজয় রতন বক্সী কর্তৃক যুগ্মভাবে লিখিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা, অর্থাৎ এখনকার এক টাকা বারো পয়সা); ৭) আফগানিস্তান ভ্রমণ; ৮) লাল চীন; ৯) China defies Death; ১০) বেদুইনের দেশে; ১১) ভয়ঙ্কর আফ্রিকা; ১২) Tour round the World without Money; ১৩) ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর; ১৪) জুজুৎসু জাপান; ১৫) প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি; ১৬) পারস্য ভ্রমণ; ১৭) বিদ্রোহী বলকান; ১৮) পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ; ১৯) জার্মানি এবং মধ্য ইউরোপ; ২০) মলয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী; ২১) মুক্ত মহাচীন; ২২) দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা; ২৩) নিগ্রো জাতির নূতন জীবন; ২৪) ভবঘুরের বিলাতযাত্রা; ২৫) ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ; ২৬) সর্বস্বাধীন শ্যাম; ২৭) অন্ধকারের আফ্রিকা; ২৮) পৃথিবীর পথে (এটি 'একপাতে রামনাথ' গোছের, মোট দশটি বইয়ের সংকলন গ্রন্থ, মূল্য ৪.০০ টাকা); ২৯) ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যটক; ৩০) ব্রহ্মদেশে ছয়মাস; ৩১) রামনাথ গ্রন্থাবলী (১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বিখ্যাত বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত পাঁচটি নির্বাচিত বইয়ের সংকলন, মূল্য ৪.০০ টাকা); ৩২) ভারত ভ্রমণ।

তাঁর লেখা গল্পের বই মোট তিনটি : ১) ভবঘুরের গল্পের ঝুলি; ২) মাউ মাউ-এর দেশে; ৩) ভবঘুরের ভীনদেশী বন্ধু।

উপন্যাস পাওয়া গেছে পাঁচটি : ১) আগুনের আলো; ২) হলিয়ুডের আত্মকথা; ৩) সাগর পারের ওপারে; ৪) আমেরিকান নিগ্রো; ৫) নাবিক।

এ-ছাড়া পাঁচটি বইয়ের যন্ত্রস্থ বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে, যেগুলির প্রকাশ সম্ভবত আদৌ হয়ে ওঠেনি : ১) ইরাণের আর্য; ২) ভ্রমণের শেষ; ৩) বিলাত ভ্রমণ; ৪) এশিয়ার ফ্রান্স; ৫) পৃথিবীর বেটারলেন্ড।

রামনাথের প্রথম দিকের বইগুলি সেই সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। বিশেষ করে 'তরুণ তুর্কী', 'আজকের আমেরিকা', 'মরণবিজয়ী চীন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ হতে থাকে, ক্রমশ। অবিভক্ত সমগ্র বাংলা জুড়ে আপামর জনসাধারণের নয়নের মণি হয়ে ওঠেন রামনাথ। তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আলোকরাশির ছটায় নিজেদের রাঙিয়ে নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মানুষজন— বাংলার ঘরে ঘরে।

রামনাথের প্রথম জীবন যদি শৈশব ও কৈশোর হয়, তাহলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই, দ্বিতীয় জীবন হচ্ছে ভবঘুরের। সেক্ষেত্রে তৃতীয় জীবন হবে অবশ্যই সাহিত্য-জীবন।

বিশ্বপথিক নিজ গুণেই প্রচার পেয়ে যাচ্ছেন দিগ্‌বিদিকে। তা দেখে কলকাতার এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক অধস্তনদের চাপা আদেশের স্বরে বলেছেন— 'ছোটলোক ছেলেটাকে পাবলিসিটি বেশি দেবেন না।' এ-কথা নিজের কানে শুনে, বহু পরিচিত বন্ধুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন তিনি, স্থায়ী ঘা-এর যন্ত্রণা বয়ে। তখনকার উন্নাসিক সাহিত্যিক মহলেও একটা কথা চালু ছিল, "রামনাথ ভূপর্যটক ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ করা বাতুলতা মাত্র।" খ্যাতনামা ভ্রমণ-সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল একবার রসিকতা করে বলেছিলেন— "তুমি তো পা দিয়ে লেখ হে।"

তাহলে তাঁর লেখাপড়ার জগতে সাধ্যমতো উঁকিঝুঁকি দেওয়া যাক। এ-কথা ঠিক, পর্যটন নিয়ে লেখার শুরুতে যা ছিল তা আদৌ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ছিল না। কখনো লেখার অভ্যেস নেই। অথচ সসাগরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতার অমৃতকুম্ভ উপচে পড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই জলোচ্ছ্বাসের মতো সব কিছুই যেন কালির আঁচড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। রচনাশৈলীগত পারিপাট্যের অভাবে সব যেন কেমন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া আঞ্চলিক শব্দের ঝনঝনা, আড়ষ্ট ভাষা, গুরুচণ্ডালী দোষ, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও ভাষা প্রয়োগের মায়াবী কৌশলের অভাবে পাঠককে হোঁচট খেতে হয়েছে, মাঝে-মধ্যেই। আসলে কড়া ধাতযুক্ত নীতিপথের মানুষ ছিলেন বলে কখনো ফেনিয়ে বলা পছন্দ করতেন না। উপরন্তু হৃদয়টি ছিল বড়ই কোমল। মানুষই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই মানুষের শোকে-দুঃখে, আপদে-বিপদে অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল ছিলেন বলে লেখার মধ্যেও ফুটে উঠত ভাবাবেগের প্রাবল্য।

তবে লেখার পারম্পর্য লক্ষ করলে চোখে পড়ে, তিনি নিজেকে তৈরি করছেন সাধ্যমতো। কারণ ভুললে চলবে না, মানুষটি চির-উদ্যমী। তাঁর লেখা অনুসরণ করলে বোঝা যায় বেদ-বাইবেল, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বঙ্কিম-রবিঠাকুর-শরৎচন্দ্র প্রমুখের বাংলা ক্লাসিকগুলি পড়ে নিয়েছেন, যতটা সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি ঘোরাফেরা করত তাঁর কণ্ঠে। ক্রমে লেখার সংস্কার ও শুদ্ধির ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকলেন শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য, আভিধানিক ভোলানাথ ঘোষ, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ যশস্বীদের কাছ থেকে। নিজেকে করে তুলছেন সাধ্যমতো উপযুক্ত।

তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় বই 'আজকের আমেরিকা'। এটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় সোজাসাপটা ভাষায় বলেছেন— "আমি সত্যের সন্ধানে দেশ ঘুরেছি। ভাষা বা সাহিত্যের টেকনিক নিয়ে রঙমশাল তৈরী করার অবকাশ পাইনি— ইচ্ছাও তেমন ছিল না। তাই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্টই থাকার কথা। তবে এটুকু সান্ত্বনা আমার যে, সত্যকথা বলতে আমি ভীত হইনি। আমার দেশবাসী অন্ততঃ একজনেরও যদি 'আজকের আমেরিকা' পড়ে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।"

লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, নিজেকে যেমন অকাট্য আত্মসমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন, আবার টপকে গিয়ে লেখক-সম্ভাবনাকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের অজ্ঞাতসারে। কেননা, কলমের টানে এমন করে সাজিয়েগুছিয়ে বলতে পারাটাই তো সেই সম্ভাবনার দুয়ার খোলা।

এ-কথা আক্ষরিকভাবে সত্যি, আপন নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও সাধনার জোরে রামনাথ তাঁর লেখা ও ভাষার উন্নতি করছিলেন একটু একটু করে। শেষের দিকের রচনাগুলি জট ও দুর্বোধ্যতা মুক্ত হয়ে অনেক বেশি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হতে থাকে। কিন্তু একটাই অভাব। তা হল কল্পনাশক্তির কারিগরি বা রচনার কলাকৌশল ও গঠনশৈলীর দিক। সব মিলিয়ে তিনটি উপন্যাস, দুটি গল্পের বই ও তিরিশটির বেশি ভ্রমণ কাহিনি পড়ে আমার মনে হয়েছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা এবং তাঁর কিছু কিছু ধারণা কাটছাঁট করে, সম্পর্কযুক্ত কিছু কল্পনামূলক অংশ জুড়ে সমগ্র রচনাকে টানটান করে বাঁধতে পারলেই হয়ে উঠত সোনায় সোহাগা। কারণ তথ্যসূত্রে এবং বিষয়ের সম্পদে বইগুলি ছিল অমূল্য। কিন্তু রামনাথের ক্ষেত্রে মুশকিল হচ্ছে, যা নিজে বোঝেননি বা দেখেননি তা বানিয়ে বানিয়ে কালির আঁচড়ে এক বর্ণও বেরোয় না। এখানেও সেই একগুঁয়ে রামা। অথচ যা একজন লেখকের বড়ই কাম্য ও সারা জীবনের সাধনা, সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল সীমাহীন। বাড়তি সংযোজন— নিজস্ব প্রজ্ঞার রশ্মি। পেটুক ঠাকুরের উদরটি ভরা থাকলে তাঁর চিন্তাশক্তি বা স্বচ্ছ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। অভিজ্ঞতার মাটি ও দূরদৃষ্টির বীজে কলাশৈলীগত জলবায়ুর মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হলে আপনিই মেলে ধরে হৃদয় জুড়ানো সাহিত্যের গাছ। তার অভাবে, রামনাথ উন্নত মানের জাতে-ওঠা সাহিত্য রচনা করতে পারেননি, ঠিক কথা। কিন্তু যা করেছেন তা একেবারে 'ব্রাত্য' বা ফেলনা মোটেই নয়— পাতে দেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। না হলে, ওইসব বই সংস্করণের পর সংস্করণ উড়ে গিয়ে, দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে তরুণ সমাজকে টগবগে উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করতে পারত না। সম্ভব হত না এত ব্যাপকভাবে তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করা। তার চাইতে বড় কথা, মনে রাখতে হবে, যাবতীয় কল্পনার অতীত প্রচণ্ড রকমের অমানুষিক কষ্ট স্বীকারের পরও নিজ প্রচেষ্টায় তুলে নিয়েছেন সরস্বতীর কলম। যা সাহিত্যধর্মের বিরোধী। এ কী ধরনের সব্যসাচী! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি— সরস্বতীর বাঁহাতি আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই ডান হাতের ছোঁয়া গ্রহণ করবেন না। বাঁ হাতে ধরা বীণাটিতে ডান হাতের শিল্পীসুলভ আঙুলের ছোঁয়া পেলে তবেই-না শিল্পের মূর্ছনা। ❑

অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষান্তর : **প্রসূন বর্মন**

প্রস্তাবনা :

আমি আজকের বক্তৃতার সূচনা করতে চাইছি সারস্বত-সাধনার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের পুণ্য স্মৃতিতে আমার সশ্রদ্ধ ও বিনম্র প্রণিপাতের মাধ্যমে। গত শতকের শুরুর দশকগুলিতে অসমের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যে-দিক্‌সন্ধানী নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তার প্রধান উদ্‌গাতা ও হোতাদের মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন অন্যতম। অসমের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেও এই মনীষীর প্রাপ্য স্বীকৃতি না-পাওয়ার বিষয়টি বেশকিছুদিন আগেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অসমের বুদ্ধিজীবী সমাজে পদ্মনাথের মতো একজন অসাধারণ পণ্ডিতকে কেন অনাদৃত, এমন-কি অবহেলিতও হতে হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহের আধারে তার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য আমি চেষ্টা চালিয়ে আসছিলাম। একসময়ে আমি এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদকে "a victim of misunderstanding" অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝির বলি হতে হয়েছিল। 'পদ্মনাথ অসমিয়া বিদ্বেষী এবং অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের স্বতন্ত্রতা-রক্ষার বিরোধী' — তাঁর বিষয়ে অসমিয়া সমাজে একসময়ে দৃঢ়নিবদ্ধ এক ধারণার কারণেই সেটা হতে পেরেছিল। বাঁহী-তে (১ম বছর ৯ম-১২শ সংখ্যা, ১৮৩২ শক) প্রকাশিত একটি রচনাই এতে অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছিল। সেই রচনাটির শিরোনাম ছিল : "অসমীয়া গৌরীপুরত বঙলা সাহিত্য-সভা"।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সেই তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক স্থিতি গ্রহণের পরে আজ পর্যন্তও যে কোনো-কোনো মহলে পদ্মনাথের বিষয়ে এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পদ্মনাথ তাঁর চিন্তা, মনন ও কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির অধ্যয়নের প্রতি যে-অবদান রেখে গেছেন তার জন্য আমাদের কাছ থেকে তাঁর বিরাগ বা অবহেলা নয়, সমাদর ও কৃতজ্ঞতাই পাওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। আমার এই বিশ্বাসের কথা একটা সাক্ষাৎকারে আমি এইভাবে ব্যক্ত করেছিলাম :

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কৃত সমালোচনার পরে আজ পর্যন্ত একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে দেখা যায় — সত্যিই তেমন ছিলেন নাকি তিনি? কিন্তু পদ্মনাথের অন্য একটা দিকও বোধহয় সামান্য হলেও অবহেলিত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির [অন্যতম] প্রতিষ্ঠাতা,

কামরূপশাসনাবলীর প্রণেতা পদ্মনাথ অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন সে-কথা বিভিন্ন বরেণ্য অসমিয়া সাহিত্যিকরা লিখে রেখে গেছেন। অতুলচন্দ্র বরুয়া প্রণীত *শরৎচন্দ্র গোস্বামী* নামক জীবনীগ্রন্থে এইরকম তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজরিকা *অসম সাহিত্য সভার রূপরেখা* (পৃ. ১৪) গ্রন্থে 'অসম সাহিত্য সভা স্থাপনর পূর্বরঙ্গ' শিরোনামে লিখেছেন :

"সেই উপলক্ষে যোরহাটে উপস্থিত অসমের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিষ্ণুরাম হল-এ সমবেত হয়ে একটি অসমিয়া সাহিত্য সভা ... স্থাপনের জন্য কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। মেঘের গর্জনই সার, বর্ষণ আর হল না। ওই বছরই গুয়াহাটির অঃ ভাঃ উঃ সাঃ [অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী] সভার এক বৈঠকে অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'অসম সাহিত্য সন্মিলন' গঠন করে সেখান থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে প্রতিনিধি পাঠানোর এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে, মূলত প্রধান সাহিত্যিকদের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাবও বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গেল।"

(*"সেই উপলক্ষে যোরহাটলৈ যোয়া অসমর বিভিন্ন স্থানর মুখিয়াল লোকসকলে বিষ্ণুরাম হলত গোটখাই এখন অসমীয়া সাহিত্য সভা... পাতিবলৈ কুরুংকারাং করিছিল। মেঘে গাজিলে, কিন্তু বরষুণ নহ'ল। সেই চনতে গুয়াহাটীর অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভার এক বৈঠকত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদে 'অসম সাহিত্য সন্মিলন' এখন গঠন করি তার পরা বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনলৈ প্রতিনিধি পঠাবর বাবেও এটা প্রস্তাব দিছিল। পিছে, ঘাইকৈ প্রধান সাহিত্যিকসকলর বিরোধিতাত সেই প্রস্তাবো ফুটুকার ফেন হৈ উরি গ'ল।"*

এ-ক্ষেত্রে পদ্মনাথের সদর্থক ভূমিকার বিষয়ে রত্নকান্ত বরকাকতী লিখেছেন :

"১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমি কটন কলেজের প্রথম বর্ষে ভরতি হই। তার কিছুদিন আগে সংস্কৃতের প্রফেসর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুগ্রহে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে [বর্ধমানের বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে] আমিও হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং সর্বেশ্বর কটকীর সঙ্গে 'হাফ কনসেশন' টিকিটে ডেলিগেট হিসাবে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিলাম। সেই বর্ধমান সাহিত্য সন্মিলন দেখার ফলেই আমি, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং অম্বিকা রায়চৌধুরী — এই তিনজনের সম্মিলিত চেষ্টায় অসম সাহিত্য সন্মিলনেরও জন্ম হল বলা যায়। আমাদের কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বে ১৯১৭ সালে ভূমিষ্ঠ হল।" (*রত্নকান্ত বরকাকতী রচনা-সম্ভার, 'আত্মবাণী'*)

(*"১৯১৫ খৃষ্টাব্দর জুলাই মাহত মই কটন কলেজর প্রথম বার্ষিকত ভর্ত্তি হওঁ। তার অলপ আগতে সংস্কৃতর প্রফেছর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়র অনুগ্রহত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দত [বৰ্দ্ধমানর বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনলৈ]ময়ো হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু সর্বেশ্বর কটকীরে সৈতে 'হাফ কনচেছন' টিকতত ডেলিগে'ট হিচাবে যাবলৈ সুবিধা পাওঁ। সেই বৰ্দ্ধমান সাহিত্য সন্মিলন দর্শনর ফলতে মই, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু অম্বিকা রায়চৌধুরী— এই তিনিজনর যুটীয়া যত্নর ফলতে অসম সাহিত্য সন্মিলনরো জন্ম হ'ল বুলিব লাগে। আমার কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরত পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বত ১৯১৭ চনত ভূমিষ্ঠ হ'ল।"*) (রত্নকান্ত বরকাকতী রচনা-সম্ভার, 'আত্মবাণী')

এইখানে আমি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জীবন ও কৃতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাইছি।

পদ্মনাথের জন্ম হয়েছিল শ্রীহট্টের বানিয়াচং গ্রামে ১৮৬৮ সালে। ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেই সময়কার অসমের মধ্যে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ১৮৮৮ সালে এফ.এ. পাশ করেন। তারপর ঢাকা কলেজে বি.এ. শ্রেণিতে ভরতি হন। ১৮৯০ সালে তিনি তিনটে বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। কিছুদিন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়ার পরে ফের ঢাকায় গিয়ে ১৮৯২ সালে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য ঢাকা সারস্বত সমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করে, যা পরে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে রূপান্তরিত হয়।

১৮৯৩ সালে পদ্মনাথ সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। সেখানে তিনি একাই চারটে বিষয়ে পাঠদান করতেন— ইংরেজি, সংস্কৃত, লজিক ও ইতিহাস। সেই সময়ে তিনি শিলঙে অসম সচিবালয়ে কেরানি হিসাবে যোগ দিয়ে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। শিলঙে থাকাকালীন তিনি শিলঙের বঙ্গীয় সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে

জড়িত হয়ে পড়েন। তখনই তিনি এডোআর্ড গেইটের *History of Assam*-এর এক সমালোচনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। তিনি সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুরমা উপত্যকার ডি.আই. অব স্কুল্‌স হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এখানেও উপরওয়ালার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁকে গুয়াহাটিতে বদলি করে লোকগণনার কাজে লাগানো হয়। ১৯০২ সালে তিনি পুনরায় সুরমা উপত্যকায় আগেকার পদে ফিরে যান। তার পরে ১৯০৫ সালে পদ্মনাথের আবেদন অনুযায়ী তাঁকে কটন কলেজে সংস্কৃত ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে নিযুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময়ে অসমের ইতিহাস প্রণেতা এডোআর্ড গেইটের সহায়করূপে পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী অসমিয়া প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্রের মিলন ঘটল এবং শুরু হল এক সার্থক বিদ্যায়তনিক সহযোগিতার পর্ব।

১৯০৯ সালে গুয়াহাটির বঙ্গীয় সমাজের এক সভায় পদ্মনাথ সর্বসম্মতিক্রমে গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সভার এক অধিবেশনে পদ্মনাথ 'নিবেদন' নামক যে-নিবন্ধ পাঠ করেন তার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বঙ্গীয় বহু সাহিত্যসেবী অসমের বিষয়ে নানান উদ্ভট কাহিনি প্রচার করেন। তাঁরা অসম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের বিষয়ে "অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন"। সেইসঙ্গে তিনি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন এইভাবে :

"যেসকল বাঙ্গালী এখানে থাকিয়া আসামের অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং এতদ্দেশ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গবাসিগণের গোচরীভূত করা।"

ক্রমে ক্রমে পদ্মনাথ অসমের সমাজ-সংস্কৃতির বিষয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ধার এবং তার প্রচারের কাজে ব্রতী হয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার বৈঠকগুলিতে অসম-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

এই সভার চতুর্থ অধিবেশনটি এই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে এখানেই অসমের প্রাচীন শাসনসমূহের লিপির পাঠ এবং তার অর্থ উদ্ধারের পদ্ধতির সঙ্গে পদ্মনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই অধিবেশনেই সুবিখ্যাত অসমিয়া পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্য বলবর্মার একটি তাম্রশাসন প্রদর্শন করেন এবং সেটা পাঠ করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এর দ্বারা পদ্মনাথ এমনভাবে চমৎকৃত ও অনুপ্রাণিত হন যে তিনি প্রাচীন কামরূপের এই ধরনের অন্যান্য শাসনের পাঠ সংগ্রহ এবং তার অর্থোদ্ধারের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ শুরু করেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত পদ্মনাথের Magnum opus — 'মহৎ কৃতি' *কামরূপশাসনাবলীর* বীজ এইভাবেই রোপিত হয়েছিল। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির জন্মকাহিনিও।

১৯১০ সালের জানুআরি মাসে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গৌরীপুরে রাজা প্রতাপচন্দ্র বরুয়ার পৃষ্ঠপোষকতায়। অসমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে প্রতাপচন্দ্রের বদান্যতার কথা সর্বজনস্বীকৃত। রাজা প্রতাপচন্দ্র অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অবশ্য সমান্তরালভাবে বঙ্গীয় ভাষা-সংস্কৃতিরও অনুরাগী ছিলেন। সেজন্যই গৌরীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনকে তাঁর আতিথেয়তা দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। সে যা-ই হোক, অধিবেশনের সভাপতিরূপে পদ্মনাথ যে-অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন— এবং যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল— সেটাতে সত্যিই অসমিয়া-বিরোধী, অসমিয়া-বিদ্বেষী মন্তব্য ছিল কি? অভিভাষণের মূল পাঠ সে-সময়ে উপলব্ধ না-হওয়ার জন্যই কি তা নিয়ে মনান্তর ঘটেছিল? সেটার কিছু নেতিবাচক বক্তব্য নিয়ে বেজবরুয়ার তোলা আপত্তির প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। এখানে তার ইতিবাচক দিকগুলি স্মরণ করা যাক।

অভিভাষণটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপের এবং এখনকার অসমের অনন্যতার জয়গান। সেইসঙ্গে প্রতিবেশী অসমের বিষয়ে বঙ্গদেশবাসীদের অজ্ঞতা ও উদ্ভট ধারণার বিরুদ্ধে ধিক্কার।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

"বঙ্গদেশবাসিগণ আসাম সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করেন, অথচ আসাম তাঁহাদের অতীব সন্নিকৃষ্ট, পূর্বে বহুদিন— এবং সম্প্রতি কিয়দ্দিন যাবৎ পুনশ্চ— তাঁহারা আসামের সঙ্গে একই প্রদেশভুক্ত। [সেই সময়ে Eastern Bengal and Assam নামে একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল।] সুদূর হিমালয়ের পথে মাসাধিক কাল পর্য্যটনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের

কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে, কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে পাঁচ ছয় দিনে যে স্থানে পৌঁছা যায়, সেই পরশুরাম ক্ষেত্রের কাহিনী এযাবৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশ হইল না। কনিষ্ক ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু অনুশীলন হইয়াছে— কিন্তু আহোম-আকবর রাজা রুদ্রসিংহের নাম কেহ জানেন কি না সন্দেহ। অমৃতসরের নামকরণ বিবরণ অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু শিবসাগরের কথা কিছুই বলিতে পারি না।"

আবার :

"আসামে যত প্রকারের জাতি ও রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায়, যত প্রকারের বিভিন্ন ভাষা ও ভূষা প্রচলিত, যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে আছে কিনা সন্দেহ।... এইসকল বিষয়ে কোনও রূপ গবেষণা করিতে হইলে, আসামে যত মালমসলা পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা সুদুর্লভ।"

স্পষ্টই বোঝা যায়, অসমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, *কামরূপশাসনাবলী* গ্রন্থ ছাড়াও পদ্মনাথ রচিত ও প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষার অন্যান্য প্রবন্ধের তালিকাটি থেকেই অসমের প্রতি তাঁর গভীর মমতার কথা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।

পদ্মনাথের রচনাপঞ্জি

ক) বাংলা ভাষায় :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

বর্ষ ও সংখ্যা

১। আসাম পর্য্যটন
১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

২। বলবর্ম্মার তাম্রশাসন
১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

৩। আসাম ভ্রমণ - দ্বিতীয় প্রবন্ধ
১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৪। আসাম ভ্রমণের পরিশিষ্ট
১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৫। দীপিকা-ছন্দ (অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ)
১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৬। আসাম ভ্রমণ - তৃতীয় প্রবন্ধ
২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৭। আসাম ভ্রমণের পরিশিষ্ট
২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৮। প্রাচীন কামরূপের রাজমালা
২০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৯। আসামের পত্র-পত্রিকা
২৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১০। আসামের নানা কথা
৩০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ঢাকা রিভিউ পত্রিকা

১। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়
১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

১। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন
সভাপতির অভিভাষণ, গৌরীপুর
১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন

খ) ইংরেজি ভাষায় :

Indian Historical Quarterly

1. Review of Sir Edward Gait's
Vol III, No.4, 1927
History of Assam
(December)

2. Early History of Kamarupa by
Vol X, No.3, 1934
RaiBahadur Kanaklal Barua (Revised)
(October)

Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal

1. Notes on Some Archaeological
Remains of Tezpur 1907

Malabar Quarterly Review

1. Reflections on the Ruins of Tezpur
Vol III, No.3, 1909

2. The Ruins of Maibong in Cachar
Vol X, No.2, 1911

3. Pilgrimage to Parasuram Kunda
March, 1924

(অন্য কিছু রচনার জন্য দেখুন প্রশান্ত চক্রবর্তী, 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও সাহিত্য', নাইন্‌থ্‌ কলাম, মে ২০১১)

এখন আমরা আবার ফিরে আসি গৌরীপুরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের ভাষণ প্রসঙ্গে, যেখানে তিনি এমন কিছু উক্তি করেছিলেন যেগুলোকে প্রত্যাহ্বান জানানো নিজের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন বেজবরুয়া। বেজবরুয়ার সমালোচনার ভাষা আক্রমণাত্মক ছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য যুক্তিহীন ছিল না। এই ধারণাও সঠিক নয় যে বেজবরুয়া অভিভাষণটির মূল পাঠটি দেখেননি (এক সময়ে আমিও সেই ধারণায় পরিচালিত হয়েছিলাম)। *ফিনিক্স* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (শরৎ ১৪১১, অক্টোবর ২০০৪) মুদ্রিত মূল পাঠ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে বেজবরুয়া সেই পাঠ থেকে যথার্থ উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। পদ্মনাথের 'অগ্রহণযোগ্য' বক্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ এই ধরনের : কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাধব কন্দলীর রামায়ণের পূর্বে রচিত; চৈতন্যদেবের প্রভাবে অসমে নববৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; অসমিয়া ভাষার মান্যরূপ সংস্কৃতমুখী হওয়া উচিত যাতে বাঙালি পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য হয়; অসমিয়াদের বিশেষ কষ্ট ছাড়াই অতি সহজে অসমিয়া ভাষাকে বিদ্যালয় ও আদালতের ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল; প্রাচীন অসমিয়া পাণ্ডুলিপিগুলি অসমিয়াদের চেয়ে বাঙালিরা বেশি ভালো করে সংরক্ষণ করতে পারবে।

এটাও সত্য যে ভাষণটিতে পদ্মনাথ অসমিয়া ভাষার স্বতন্ত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। কিন্তু তিনি যেন মুক্তমনে এই স্বতন্ত্রতা মেনে নিতে পারেননি, বরং বঙ্গভাষার মাধ্যমে বাঙালি ও অসমিয়া "বিবাহাদি সূত্রে সম্বন্ধ হইয়া এক হইয়া যাওয়া"র পক্ষপাতী ছিলেন।

অভিভাষণটির শেষদিকে বিদ্যাবিনোদ যেন আত্মপক্ষ সমর্থনে এই কথাগুলো বলেছিলেন। (তিনি নিশ্চয় সচেতন হয়েছিলেন যে তাঁর কিছু উক্তি ও কর্মের ফলে তিনি অসমিয়াদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।) :

"আমার অভিভাষণ আকর্ণনান্তর কোনও কোনও আসামবাসী মহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমরা বুঝি অসমিয়া ভাষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে বঙ্গভাষা চলাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ধারণা নিতান্তই অমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মৎপঠিত অভিভাষণে এবং অসমীয়া প্রবন্ধে ঈদৃশ আশঙ্কার [পরিপোষক] কোনই কথা নাই। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, অসমীয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।"

আপত্তি? আপত্তির প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? এটা যেন অনুগ্রহ করে অনুমতি দেওয়ার মতো কথা।

(পদ্মনাথের গৌরীপুর অভিভাষণের মূল পাঠের জন্য 'ফিনিক্স'-এর উল্লিখিত সংখ্যাটি দেখুন।)

পদ্মনাথের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার বিশেষ অনুরাগী হয়েও আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে অসমের সম্পর্কে পদ্মনাথের মনে এক ধরনের স্ববিরোধ ক্রিয়া করেছিল। অসমের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, তার মানবকুলের জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য এবং বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা তিনি যে-উদারতা ও মুগ্ধতায় বর্ণনা করেছিলেন, অসমিয়ার ভাষা সম্পর্কে যেন তার অভাব ঘটেছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি সমান অকৃপণ হতে পারেননি।

আর-একটা কথা। পদ্মনাথ যদিও মাঝে মাঝে বঙ্গদেশবাসীদের সমালোচনা করেছেন, নিজেকে অসমবাসী বলেননি। বরং 'আমরা' বলতে তিনি নিজেকে বঙ্গদেশীয়ের সারিতে রেখেছেন— পরোক্ষভাবে হলেও। অথচ পদ্মনাথের সময়ে শ্রীহট্ট অসমের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। শ্রীহট্ট বা সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ এবং গুয়াহাটির কটন কলেজ দুটোই ছিল অসম সরকারের অধীন কলেজ। মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে পদ্মনাথ পরে কটন কলেজে আসেন। অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে শ্রীহট্টবাসীগণের নিজেদের অসমবাসী বলে পরিচয় না-দেওয়া— এবং অসমিয়াদের কাছ থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে যাওয়াটা— সেই সময়ের এক "সামাজিক বাস্তব" ছিল।

পরিশেষে পদ্মনাথের গবেষণা-কর্মের এক স্বল্প-চর্চিত দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি : সেটা হল পদ্মনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চা। এ-বিষয়ে আগেও আমার খানিকটা ধারণা ছিল, তবে পরবর্তীকালে কিছু বিশদ তথ্য আমার হাতে পড়ায় লোকসংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি এবং পদ্মনাথের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

১৮৯৮ সাল থেকে সিলেটের ডি.সি. অর্থাৎ জেলাশাসক ছিলেন পেটিয়ার্স নামক একজন বিদ্যানুরাগী ব্রিটিশ অফিসার।

পদ্মনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। সেই সময়ে Crookes নামক একজন ICS অফিসার উত্তর ভারতের বিভিন্ন জেলার লোকাচারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়েছিলেন সরকারি যন্ত্রের মাধ্যমে। সেই অনুসারে পেটিয়ার্সও সিলেট জেলার লোকাচারের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পদ্মনাথের হাতে ন্যস্ত করেন। পদ্মনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় সেই কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইভাবে পদ্মনাথ হয়ে পড়েন লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ও চর্চাকারী। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি স্থানীয় কাগজপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও ১৮৯৮ সালে 'Folk Customs and Folklore of Sylhet' নামে ইংরেজিতে একটি মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন এবং সেটা প্রকাশিত হয় বিখ্যাত Man in India পত্রিকায়, ১৯৩০ সালে (Vol X, No. 2-3)। এইভাবে পদ্মনাথের প্রতি আমার পূর্বের আকর্ষণে আরও এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

আমার পরম সৌভাগ্য যে সেই পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নামাঙ্কিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই কাজের জন্য আমি কতটা উপযুক্ত সে-বিষয়ে আমার নিজের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি উদ্যোক্তাদের এই আমন্ত্রণ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছি এই কারণেই যে, সেই মহান পণ্ডিতের প্রতি আমার বিদ্যায়তনিক ঋণ শোধ করার সুযোগ এর মাধ্যমে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্য আমি ন্যাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই সুযোগে আমি রমানাথ ভট্টাচার্য ন্যাসের কর্মকর্তাদের বিবেচনার জন্য বিনম্রভাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইছি। তাঁরা পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রস্তুত করিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। জীবনীটির ইংরেজি, অসমিয়া ও বাংলা তিনটি সংস্করণ হলে ভালো হয় বলে আমি মনে করি।

এই প্রস্তাবনা অংশ শেষ করার আগে আমি আমার দুজন কনিষ্ঠ বিদ্বান-সুহৃদদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে আমার ঋণ স্বীকার কর্তব্য মনে করছি। পদ্মনাথের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ছাড়াও সময়ে সময়ে এই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমার উপকারকারী সেই সুহৃদ দুজনের একজন হলেন শিলচরের নিরলস গবেষক সুপরিচিত পণ্ডিত ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং অন্যজন সদাতৎপর জ্ঞানান্বেষী তরুণ কটন কলেজের বাংলা বিভাগের ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী।

এই ক'টি কথায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের স্মৃতি-তর্পণ করার পরে এখন আমি আজকের মূল বক্তৃতার বিষয়ে প্রবেশ করছি।

ভৌগোলিক দিক থেকে গোয়ালপাড়িয়া অভিধাটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্তের গোয়ালপাড়া নামে চিহ্নিত এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এই অঞ্চল ব্রিটিশ প্রশাসিত অসম প্রদেশের এবং স্বরাজোত্তর কালে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্রশাসনিক বিভাজনের পুনর্বিন্যাসের ফলে পূর্বের গোয়ালপাড়া জেলা চারটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে — ধুবুড়ি, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও ও গোয়ালপাড়া। বোড়োভূমির স্বীকৃতির পরে এই বিন্যাসে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এইসব প্রশাসনিক পরিবর্তন মেনে নিয়েও গোয়ালপাড়া অঞ্চল বোঝাতে পূর্বতন গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীরা প্রায়ই 'অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা' আখ্যাটি ব্যবহার করেন। তার কারণ এটাই যে, ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক গঠন ছাড়াও 'গোয়ালপাড়া' নামটির সঙ্গে অন্য এক বৈশিষ্ট্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে : সেটা হল এই অঞ্চলটির লোকসংস্কৃতি। যেহেতু লোকসংস্কৃতির এক প্রধান উপাদান হচ্ছে লোকগীত সেজন্যে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের চরিত্রের বিচার হওয়া প্রয়োজন গোয়ালপাড়িয়া লোকসংস্কৃতির আধারে। আজ আমি সামগ্রিক অসমিয়া লোকসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই করার চেষ্টা করব।

আমরা জানি যে অসমিয়া সংস্কৃতি এক সমরূপ (uniform), একপ্রস্তর (monolithic) সংস্কৃতি নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ, সমাহার ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অসমিয়া সংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দুই পারে নদীটির নামে চিহ্নিত দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত উপত্যকাকেই অসমিয়া সংস্কৃতির 'মান্য' রূপের লীলাভূমি বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ এই মান্য রূপও প্রকৃতার্থে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে তৎসংলগ্ন পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে আহৃত সাংস্কৃতিক উপাদানে পুষ্ট।

আজকের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমার পূর্বের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে চাইছি :

"এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অনেক সময় অসমিয়া সংস্কৃতির এক কাল্পনিক মান্যরূপের আধারে জনগোষ্ঠীগত ও অঞ্চলগত সাংস্কৃতিক সম্পদের বিচার করি এবং তার ফলে সেই তথাকথিত মান্যরূপের সঙ্গে বিসদৃশ উপাদানগুলিকে হয় অস্বীকার করি, নয়তো অবজ্ঞা করি। অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও আবেগিক বিচারে আমরা যে-সব সম্পদকে নিজের বলে গৌরব করি, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলিকেই স্বীকৃতি দিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। এ-ধরনের স্ব-বিরোধ আমাদের মধ্যে আছে বলেই কখনো কখনো ব্যক্তিগত ও সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়।

"গোয়ালপাড়িয়া সংস্কৃতি এবং অসমিয়া সংস্কৃতির স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ-রকম স্ব-বিরোধের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। স্থানীয় কথাবার্তা, বিচার-বিশ্বাস, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির জন্যই গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতিকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। অনেকসময় এটা উপেক্ষার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রূপের এবং সীমিত ক্ষেত্রে হলেও বিদ্বেষেরও বলি হতে হয়েছে। অথচ কোন্ সচেতন অসমিয়া জানেন না এবং গৌরববোধ করেন না যে প্রাচীন অসমের ভূখণ্ড সর্বদাই গোয়ালপাড়া তো বটেই, সেইসঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং প্রায়শ তার পশ্চিমের বহু অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, প্রাচীন কামরূপের চার পীঠের মধ্যে রত্নপীঠ ও কামপীঠের অবস্থান ছিল প্রধানত এই গোয়ালপাড়াকে ঘিরেই, মধ্যযুগের অসমের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কামতা ও কোচ রাজশক্তির লীলাভূমি ছিল এই গোয়ালপাড়া, অসমের সংস্কৃতিতে যিনি অভূতপূর্ব অবদান রেখে গিয়েছেন কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেই বিশ্বসিংহের জন্ম হয়েছিল এই গোয়ালপাড়ারই চিকনাঝারে, অসমিয়া সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়ের বার্তাবাহী মহাপুরুষদের পুণ্য বিচরণভূমি ছিল গোয়ালপাড়া সহ এই পশ্চিমপ্রান্ত?"

(*"এইটো স্বীকার করিব লাগিব যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রত আমার বহুতেই বহু সময়ত অসমীয়া সংস্কৃতির এক কাল্পনিক মান্য রূপর আধারত আমার জনগোষ্ঠীগত আরু অঞ্চলগত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহর বিচার করোঁ, আরু ফলত সেই তথাকথিত মান্য রূপর লগত সাদৃশ্য নথকা উপাদানবোরক হয় অস্বীকার করোঁ, নহয় অবজ্ঞা করোঁ। অর্থাৎ, তাত্ত্বিক আরু আবেগিক বিচারেরে আমি যিবোর সম্পদক নিজর বুলি গৌরব করোঁ, ব্যবহারিক দিশত সেইবোরকেই স্বীকৃতি দিবলৈ আমি কুণ্ঠা বোধ করোঁ। এই ধরনর স্ব-বিরোধ আমার ভিতরত আছে বুলিয়েই আমি সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত আরু সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বত ভুগিবলগীয় হয়।*

"গোয়ালপরীয়া সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতির স্থান-নির্ধারণর ক্ষেত্রত এনে স্ব-বিরোধর দ্বন্দ্বই ভালেখিনি কাম করিছে। থলুআ মাত-কথা, বিচার-বিশ্বাস, ক্রিয়া-কর্ম আদির কারণেই গোয়ালপারার সংস্কৃতিক সন্দেহর চকুরে চোয়া হৈছে। বহুসময়ত ই উপেক্ষার, কোনো কোনো ক্ষেত্রত বিদ্রুপর আরু সীমিত ক্ষেত্রত হ'লেও, বিদ্বেষরো বলি হ'ব লগা হৈছে। অথচ কোন সচেতন অসমীয়াই নাজানে আরু গৌরব বোধ নকরে যে প্রাচীন অসমর ভূখণ্ডই সদায় গোয়ালপারার তো কথাই নাই, সমগ্র উত্তর বঙ্গকো আরু প্রায়ে তার পশ্চিমর বহু ঠাই সামরি লৈছিল, প্রাচীন কামরূপর চারি পিঠর ভিতরত রত্নপীঠ আরু কামপীঠর অবস্থান আছিল ঘাইকৈ এই গোয়ালপারাকে লৈ, মধ্যযুগর অসমর গৌরবোজ্জ্বল দিনর কমতা আরু কোঁচ রাজশক্তির লীলা ভূমি আছিল এই গোয়ালপারা, অসমর সংস্কৃতিত অপূর্ব অবদান যোগোয়া কোঁচ বংশর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহর জন্ম হৈছিল এই গোয়ালপারারেই চিকনাঝারত, অসমীয়া সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়র বার্তাবাহী মহাপুরুষ সকলর পুণ্য বিচরণভূমি আছিল গোয়ালপারাকে লৈ এই পশ্চিম প্রান্ত?") [দ্র. গোয়ালপারার লোক-সংস্কৃতি আরু অসমীয় সংস্কৃতিলৈ ইয়ার অবদান, ধুবুরী, ১৯৮২]

সাধারণত অসমিয়া সংস্কৃতি মোটামুটি দুটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাজিত — উজান অসম এবং নামনি অসম। ব্রহ্মপুত্রের দুই পারে পূর্ব প্রান্তের তিনসুকিয়া ও ধেমাজি জেলা থেকে শুরু করে শোণিতপুর ও নগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি উজান অসমের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। অনুরূপভাবে মরিগাঁও ও দরং জেলা থেকে শুরু করে পশ্চিম প্রান্তের গোয়ালপাড়া, ধুবুড়ি ও কোকরাঝাড় জেলা পর্যন্ত বিভাজিত অঞ্চলটি নামনি অসমের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। তবে নামনি অসমের ক্ষেত্রে আবার দুটো উপ-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় : দরং থেকে শুরু করে গোয়ালপাড়ার পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। অন্যদিকে পশ্চিম গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতির যে-স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা সেই ভূখণ্ডের নিকটবর্তী কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত

রংপুর জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমগোত্রীয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অসমিয়া সংস্কৃতির পশ্চিমের সীমা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অতিক্রম করে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এই সমগ্র অঞ্চলের সংস্কৃতি অসমিয়া সংস্কৃতির ভাটির ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা 'দেশী মান্‌ষি' (দেশী মানুষ) বলে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে এই 'দেশী মান্‌ষি'দের সংস্কৃতি পুরনো অসমিয়া বা কামরূপী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে। সামগ্রিকভাবে অসমিয়া সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসে এই 'দেশী' সংস্কৃতির যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটাকে ভুললে চলবে না।

এখানে একটি বিশেষ প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাইছি। পশ্চিম গোয়ালপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্যপূর্ণ বিবিধ উপাদান লক্ষ করা যায়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ওইরকম উপাদানের সবটাই বঙ্গীয় সংস্কৃতি থেকে ঋণরূপে আহৃত বা তার প্রভাবে সৃষ্ট। অঞ্চলটির সমাজ সেই উপাদানগুলিকে নিজস্ব বলেই মেনে এসেছে। অন্যদিকে, অঞ্চলটির স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে বঙ্গীয় মান্য সংস্কৃতির বিচারে 'ব্রাত্য' বলে ধরে নেওয়াটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। উল্লেখ করা উচিত যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিম গোয়ালপাড়ার স্থানীয় সমাজ এবং অসমের বাকি অংশের অসমিয়া সমাজের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব ছিল। গোয়ালপাড়িয়া সংস্কৃতি বিষয়ে অসমের বাকি অংশের মানুষের সন্দেহের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এটাও স্বীকার করতে হবে যে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম গোয়ালপাড়ার মানুষ অসমিয়া সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের নৈকট্যের বিষয়ে এক ধরনের দ্বন্দ্বে ভুগত। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সেই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তবে এখানে তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের আজকের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে ইতিমধ্যেই সেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এবং পশ্চিম গোয়ালপাড়ার মানুষ নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসমিয়া সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বলে ঘোষণা করে গৌরব অনুভব করে; সেই সমাজটির অসমিয়াত্বের চেতনা এখন অন্যান্য অঞ্চলের অসমিয়া সমাজের অনুরূপ প্রখর।

আমার বক্তৃতার শিরোনামে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের যে-অবধারণা নিহিত, তার উৎস হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কিছুক্ষণ পূর্বে বর্ণিত অসমিয়া সংস্কৃতির— বিশেষভাবে অসমিয়া লোকসংস্কৃতির— অসাধারণ বৈচিত্র্য। লোকগীতগুলিকে যে-কোনো গোষ্ঠী বা অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। উজান অসম, নামনি অসম এবং তারও পশ্চিমের কিছুটা অন্তর্ভুক্ত করে আমি অসমিয়া সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের যে-ছবিটি তুলে ধরেছি তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় এই বহুল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটির বিভিন্ন প্রান্তে রাশিকৃত লোকগীতের বিপুল সম্ভারের মধ্যে। এই সমস্ত লোকগীত অসমিয়া ভাষায় রচিত হলেও তার প্রতিটিই নিজ নিজ স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র ও একক। অঞ্চল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতির দ্বারা এই স্বকীয়তা কীভাবে নিরূপিত হয় সেটা কিছু উদাহরণ সহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক।

অসমিয়া বর্ণহিন্দু সমাজে প্রচলিত গীতের ('গীত-মাতের') যে-রূপ সেটা অসমিয়া মুসলমান সমাজে প্রচলিত গীতের ('গীত-মাত') রূপের অনুরূপ নয়। বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা বেশি স্পষ্ট। অসমিয়া মুসলমান সমাজে এমন কিছু বিশেষ শ্রেণির গীত-পদ আছে যেগুলো সেই সমাজের বিশেষ সম্পদ— যেমন, উজানের মুসলমানদের 'জিকির-জারি' এবং দরঙের মুসলমানদের 'চেরা ঢেক'। সেইরকমভাবে অসমিয়াভাষী উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের গীতকে অ-উপজাতীয় অসমিয়া সমাজের গীত থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। উজানের সোনোয়াল-কাছাড়ি, অসমিয়াভাষী দেউরি, নামনির সমতলের তিওয়া এবং পাতিরাভাদের গীতে নিজস্ব ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়ে আসছে। আবার, কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠী দ্বিভাষী : তারা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব উপজাতীয় ভাষায় কথা বললেও বাইরে ভাববিনিময়ের জন্য স্থানীয় অসমিয়া ভাষার রূপই প্রয়োগ করে। এদের মধ্যেও উপজাতীয় গুণবিশিষ্ট অসমিয়া গীতের বেশকিছু উদাহরণ পাওয়া যায়।

আমরা গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের বিশেষ ভুবনে প্রবেশের প্রাক্কালে গোয়ালপাড়ার— বিশেষ করে এর পশ্চিম অঞ্চলের— জনবিন্যাস, প্রশাসনিক এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণি-বিভাজন, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের সন্ধান নেওয়া এই কারণেই প্রয়োজন মনে করছি যে, সেইসব বিষয়ে অন্তত মোটামুটি ধারণা না-

থাকলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণির লোকগীতের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনে অসুবিধা হবে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কোচ-রাজবংশী গোষ্ঠীর প্রাধান্য মনে রাখার বিষয়। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা বর্ণহিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের অধিকাংশই বোড়ো, রাভা প্রভৃতি উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে এই সমাজে প্রবেশ করেছে— ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। শেষতমভাবে এই গোষ্ঠীর মানুষদের গরিষ্ঠাংশই উপজাতীয় হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি সমর্থন করে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা প্রভৃতি 'উচ্চ' বর্ণের লোকেরা সংখ্যায় কম হলেও প্রভাবের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। কৈবর্ত, কুমার, হিরা, মালি অর্থাৎ শোলাশিল্পীর বৃত্তিধারীদেরও সমাজে বিশেষ বিশেষ স্থান আছে।

জেলাটিতে স্থানীয় মুসলমান মানুষের জনসংখ্যার অনুপাতও বেশি। তারা ধর্মের দিক থেকে ইসলামের অনুগামী হলেও সংস্কৃতির দিক থেকে একশো শতাংশই 'দেশী'। তারা পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমানদের 'ভাটিয়া' নামে চিহ্নিত করে নিজেদের স্বকীয় সত্তার পরিচয় দেয়।

কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত না-হলেও অঞ্চলটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গাঁথনিতে দুটো বিশেষ বৃত্তির গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তার একটা হল বন্য হাতি শিকার ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত 'মাউত-ফান্দি'র বৃত্তি (মাহুতের এবং ফাঁদে ফেলে হাতি ধরার কাজ) এবং অন্যটা হল মোষের গোয়ালে মোষের দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত 'মৈষাল' (মহিষপালক) বা মোষ-গোয়ালার বৃত্তি। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়টা এই যে একদিকে হাতি-ফান্দির জীবনকে কেন্দ্র করে এবং অন্যদিকে মৈষালের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত কয়েকটি অত্যন্ত আকর্ষক লোকগীত, যেগুলো গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

অঞ্চলটির অধিকাংশ মানুষই অবশ্য মূলত কৃষিজীবী, তারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত না-হলেও অন্যভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া অঞ্চলটির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনধারায় এমন একটা বিশেষ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল যেটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য অংশে অপরিচিত ছিল— তা হল জমিদারি প্রথা। এই প্রথা সমাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছিল: বিভিন্ন স্তরের জমির মালিক এবং জমির ওপর অধিকারবিহীন কৃষিকর্মী। জমিদারি প্রথার বিলোপ হলেও সেই প্রথার প্রভাবের অবশিষ্টাংশ এখনও সমাজে কিছু কিছু রয়ে গেছে। মনে রাখার বিষয় হল, বেশকিছু গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতে জমিদারি প্রথার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক জীবনের চিত্র অক্ষুণ্ণ আছে।

সেইরকমভাবে অঞ্চলটির বিবাহপ্রথার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো বিবাহ-আশ্রিত লোকগীতের অন্দরমহলের সংবাদ পেতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলের বহু গীতে 'পণ', 'ঘটক', 'বেচেয়া (বিক্রি করে) খাওয়া' প্রভৃতি অভিধার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেগুলোর সঙ্গে অঞ্চলটির বিবাহ-পদ্ধতির সম্পর্ক রয়েছে। পণ শব্দের মূল অর্থ হল 'গা-ধন' (bride-price বা স্ত্রী-ধন)— পাত্রীর জন্য পাত্রপক্ষের দেওয়া ধন বা অন্য ধরনের মূল্যই হল পণ। ধন বা মূল্য নিয়ে পাত্রীকে বিদায় দেওয়া হয় বলে একে বিক্রি করার তুল্য বলে ধরা হয়। সেজন্যই মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে 'বেচেয়া খাওয়া' (বিক্রি করা) বা 'বিলিয়া খাওয়া' অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা হয়। আজকাল অবশ্য উলটোভাবে পাত্রপক্ষকেই টাকাপয়সা বা অন্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তবুও বেচেয়া খাওয়া কথাটির প্রচলন এখনও আছে— বিশেষ করে লোকগীতে। সেইভাবে একসময়ে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ সাধনে ঘটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার নিদর্শন এখনও লোকগীতে রয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত অন্য একটা সমাজ-বাস্তবতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়। আগে অনেক সময় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কমবয়সি কনেকে বেশি বয়স্ক, এমন-কি বুড়ো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত, স্বামীর সঙ্গে অসন্তুষ্ট যুবতী নারীর তরুণ পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটাও ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সেজন্যই বহুসংখ্যক গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের উপজীব্য হল পরকীয়া প্রেম। আবার, বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিবাহিতা বহু তরুণীকে অকালবৈধব্যের গ্রাসে পড়তে হয়েছিল। অতৃপ্ত কামনার বলি যুবতী বিধবার পুরুষ-সঙ্গ লাভের বাসনার প্রকাশও কিছু কিছু গীতে পাওয়া যায়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বিবাহ ইত্যাদি সহ জীবনচক্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গীতের চরিত্র অসমের অন্যান্য অঞ্চলের গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পশ্চিম ভূভাগের বিয়ের গীতের এমন এক বিশেষ শ্রেণি আছে যা অন্য অঞ্চলে প্রায় শোনাই যায় না। সেটা হল মুসলমানি বিয়ের গীত। স্থানীয় মুসলমান সমাজে

কনেকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী মহিলারা নেচে নেচে যে-সব গীত গায় সেগুলোর আবেদন অসাধারণ।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতির বিচারে গোয়ালপাড়ায়— বিশেষত পশ্চিম এলাকায় বিশেষ ধরনের এমন কিছু উপাদান আছে যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলে অনুপস্থিত। সেই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'কাতি' (কার্তিক) পূজা, 'হুদুম দেও' (হুদুম দেব) পূজা, বাঁশ পূজা এবং সোনারায় পূজা। কাতি-পূজা হল সন্তানহীনা বিবাহিত মহিলার সন্তান-কামনা এবং পুত্রসন্তানহীন মাতার পুত্রসন্তান কামনায় আয়োজিত এক নারী-প্রধান অনুষ্ঠান। হুদুম দেও পূজা অন্য এক নারী-প্রধান অনুষ্ঠান যা অনাবৃষ্টির সময়ে গোপন ধরনের আচারে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বাঁশ-পূজা হচ্ছে প্রজনন-ভাবনায় পুষ্ট এক পুরুষ-প্রধান অনুষ্ঠান। এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানেই কমবেশি 'অশ্লীলতা'র প্রকাশ রয়েছে— যেটাকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করা হয়। সোনারায়-পূজা হল ব্যাঘ্র-দেবতা সোনারায়কে তুষ্ট করার জন্য প্রধানত রাখাল ছেলেদের অংশগ্রহণের অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই কাহিনিমূলক ও অন্যান্য ধরনের গীত (সঙ্গে নৃত্য) পরিবেশন করা হয়।

গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় কুশান-গান, পালা-গান, ভারি-গান প্রভৃতি লোকনাট্যগুলিতে কাহিনি-চক্রের গীত ছাড়াও পয়ার, চটকা, খেমটা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের ও রসের সমাবেশ ঘটে।

লোকগীতের আলোচনায় ভাষা— বিশেষত স্থানীয় কথ্য ভাষার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। যখন আমরা সাধারণীকরণ করে অসমিয়া লোকগীতের কথা বলি তখন এই ভাষিক বা উপভাষিক দিকটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই না। সামগ্রিকভাবে অসমিয়া লোকগীতের সমস্ত উপাদান অসমিয়া ভাষাতেই প্রকাশিত এটা ঠিক, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও সত্য যে এই সবগুলিরই অসমিয়া ভাষা সমরূপের নয়। উজান থেকে নামনি পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীতগুলি ভাষাটির ক্ষেত্রীয় ও জনগোষ্ঠীগত বিশেষ বিশেষ রূপে রচিত। অর্থাৎ আমরা অসমিয়া লোকগীতের যে-বৈচিত্র্যের কথা বলছি তা শুধু লোকগীতের শ্রেণির বিভিন্নতা ও প্রাচুর্যের ওপরই নির্ভর করে না, কথ্য ভাষার স্বকীয়তাতেও সেই বৈচিত্র্য অতিরিক্ত মাত্রা এনে দেয়। উজান অসমের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে ছোট-ছোট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাষার ক্ষেত্রে এক সমরূপতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নামনি অসমে তার জায়গায় দেখা যায় প্রায় বিভ্রান্তিকর ভাষিক পরিস্থিতি : এখানে দরঙি, মরিগএগা (মরিগাঁওয়ের), পূর্ব কামরূপী, পশ্চিম কামরূপী, পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া, মধ্য গোয়ালপাড়িয়া, পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়া ইত্যাদি রূপ তো রয়েছেই, তা ছাড়া এগুলোর বাইরেও রয়েছে বিভিন্ন উপরূপ। সে যা-ই হোক, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাকে গোয়ালপাড়িয়া বলে ধরে নেওয়া হলেও তার মধ্যে পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া ও কিছু পরিমাণে মধ্য গোয়ালপাড়িয়ার রূপের সঙ্গে অন্যান্য অসমিয়া উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য নেই। কিন্তু রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় দিকেই পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়ার এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো অনভ্যস্তজনের পক্ষে সহজে বোধগম্য নয়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রূপতাত্ত্বিক দিকের চেয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকে অধিক প্রকট। উদাহরণস্বরূপ, এই উপভাষায় মূর্ধন্য ট-বর্গ আর দন্ত্য ত-বর্গের বর্ণের স্বতন্ত্র মূর্ধন্য ও দন্ত্য উচ্চারণ আছে, যা অসমিয়ার অন্যান্য উপভাষায় নেই। অনুরূপভাবে, চ ও ছ-র ঘৃষ্ট তালব্য উচ্চারণ অনেকটাই রক্ষিত হয় — যা সাধারণত অসমিয়াতে করা হয় না। আবার, অসমিয়া ভাষার শ, ষ ও স-র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উষ্ম কণ্ঠ্য ধ্বনি এখানে অনুপস্থিত। বরং তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রেই উষ্ম তালব্য ধ্বনির প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেজন্য পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের বহু উপাদান বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া এবং এমন-কি পশ্চিম কামরূপী ও দরঙি লোকগীতের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি এমন এক বিশেষ ধরনের আবেশের সৃষ্টি করে যা একান্তভাবে এই শ্রেণির গীতের নিজস্ব সম্পদ।

এইখানে আমরা Folkloristics অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতিতে লোকগীতের স্থান ও তার চরিত্রের বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথাগতভাবে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে লোকসংস্কৃতির যে-চারটি প্রধান ক্ষেত্রকে মান্যতা দেওয়া হয়ে আসছে সেই কয়টির বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

প্রথম ক্ষেত্রটি হচ্ছে লোকসাহিত্য (Folk literature) বা

মৌখিক সাহিত্য (Oral literature)। একেই কেউ-কেউ বাচিক শিল্প (Verbal art) নাম দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন শ্রেণির কাহিনিজাতীয় উপাদান, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও ছড়া, এবং পড়ে গীতের কথা-অংশ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে ইংরেজিতে Social Folk Custom এবং অসমিয়াতে সামাজিক লোকায়ত রীতি-নীতি বলা হয়। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে আছে লোকায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার-নীতি, লোকায়ত চিকিৎসা-পদ্ধতি, লোকায়ত খাদ্যাভ্যাস এবং রন্ধনপ্রণালি ইত্যাদি। এর পরে রয়েছে অন্য এক ক্ষেত্র যাকে ইংরেজিতে Physical Folklife বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অসমিয়া নামকরণ আবয়বিক লোকায়ত জীবনচর্যা করা যায়। পুতুল ইত্যাদি সহ নানা ধরনের লোক-ভাস্কর্য, গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম সহ লোকায়ত ভাস্কর্য, বয়ন-শিল্প, বাঁশ-বেতের শিল্প ইত্যাদি— নৃতত্ত্ববিদগণ এগুলিকেই বস্তুগত সংস্কৃতি বা Material Culture নামে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রটির নাম হচ্ছে লোকায়ত পরিবেশন-শিল্প (Folk Performing Arts) যার মধ্যে লোকসংগীত, লোকনৃত্য আর লোকনাট্য প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এই ক্ষেত্রগুলি পরস্পর সম্পর্কবিহীন ও স্বতন্ত্র নয় : একটা ক্ষেত্রের উপাদানের সঙ্গে অন্য একটা ক্ষেত্রের এক বা একাধিক উপাদানের ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রতি লক্ষ রেখে উদাহরণস্বরূপ লোকগীতের বিষয়টিই উত্থাপন করা যেতে পারে। লোকগীতে দুই ধরনের উপাদান যুক্ত হয়ে থাকে। একটা হল তার কথা অংশ, যা লোকসাহিত্যের উপাদান; আর অন্যটা হল সংশ্লিষ্ট গীতের সাংগীতিক বিন্যাস— তার সুর ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এই দুই প্রকার উপাদানের বিশ্লেষণ করা হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে লোকগীতের অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ হয় বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য লোকগীতের সংগ্রহ, শ্রেণিবন্ধন ও অধ্যয়নের অধিকাংশ বিদ্যায়তনিক কর্ম শুধু গীতের কথা অংশকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হতে দেখা যায়, তার সাংগীতিক দিকটি প্রায় উপেক্ষিতই থেকে যায়।

লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়নের মধ্য দিয়েও সংশ্লিষ্ট সমাজের ভিতরকার এমন কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব, যেগুলো শুধু লোকগীতের কথা-অংশ থেকে পাওয়া যায় না। লোকসংগীতকে এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিককালে যে-অধ্যয়ন ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করছে তার নাম হল Ethnomusicology। একে আমরা জাতিসত্তাভিত্তিক সংগীত-বিজ্ঞান বলতে পারি। Ethnomusicology-র এক শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের নাম হল Allan Lomax। 'Folksong Style And Culture' শীর্ষক Lomax-এর বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থটিতে সংগীতের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তাকে বিরল বলা যেতে পারে। কয়েকটি দেশে Ethnomusicology বিদ্যায়তনিক দিকে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। সেই তুলনায় আমাদের দেশে এটা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থাতেই রয়েছে।

এই আলোচনার সূত্র ধরে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের অন্য এক মাত্রা বা আয়তনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় : তা হল সাংগীতিক বিন্যাসের মাত্রা। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর দিক থেকে যেভাবে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি সেইভাবে সাংগীতিক বিন্যাসের দিক থেকেও অসমিয়া লোকগীতের বহুবর্ণী চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। উজান অসম ও নামনি অসমের লোকগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার দুটি মৌলিক ভিত্তি আছে। উজান অসমের লোকগীতে বিহুগীতের কোমল স্বর-আশ্রিত সুরের পঞ্চস্বর যুক্ত গাঁথনির প্রাধান্য। আবার সেখানে রয়েছে বিহু ঢোলের তালের সঙ্গে যুক্ত নিজস্ব ছন্দোবিন্যাসের উপস্থিতি। সে-ক্ষেত্রে নামনি অসমে প্রধানত দোতারার ছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অধিক স্বরসংযুক্ত জটিল সাংগীতিক গাঁথনি সহজলভ্য। সাংগীতিক বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও একটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় : তা হল একটি রচনাকে ভিন্ন ভিন্ন context বা সন্দর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর-ছন্দে বাঁধা হলে লোকগীতে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক রসের রচনার উদাহরণ নেওয়া যাক। 'নামে গঙ্গাজল লবলৈ কোমল বৈ আছে হৃদয়র মাজে'— পরম্পরাগত এই রচনাটি গোয়ালপাড়ার পূর্ব অঞ্চলে 'গুপুনী' নামের রূপে গাওয়া হয়, কামরূপে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ লোকগীতের ধুরা বা ঘোষার (ধুয়া) কাজ করে, আবার জিগিরের সাংগীতিক গাঁথনির মধ্যেও একে ধরে রাখা হয়েছে। সেইভাবে 'নাম-ঘোষা'র (মহাপুরুষ শংকরদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব রচিত অসমিয়া বৈষ্ণব ভক্তিগীতি) কিছু রচনা 'নামঘর'-এ (অসমিয়া বৈষ্ণবদের উপাসনাগৃহ) গাওয়া হয়, কখনো

কামরূপী লোকগীতের রূপে পরিবেশিত হয় এবং কখনো স্বরচিত ঘোষা-সহযোগে উজান অসমের গ্রামীণ শিল্পীরা 'টোকারি-গীতের' অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কথা ও সংগীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল কাহিনি-গীত বা 'মালিতা'গুলি। কাহিনি-গীত অভিধাটি এই সূচিত করে যে এটি একাধারে কাহিনি ও গীত। ইংরেজিতে এটাই ballad নামে পরিচিত। Ballad-এর সংজ্ঞা সহজ কথায় এভাবে দেওয়া হয় : A ballad is a story that is sung or a song that tells a story.

আজকের এই বক্তৃতার মাধ্যমে অসমিয়া লোকগীতের— এবং বিশেষ করে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের— কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হল। আমার এই প্রয়াসে যে বহু অপূর্ণতা, বহু দুর্বলতা থেকে গেছে সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি ধরে নিয়েছি যে আমার বক্তব্যের বিষয়ে শ্রোতাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। উদ্যোক্তারা যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে আমি তাঁদের সন্দেহ নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

কিন্তু আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের সকলের হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা আমি নিজেই করতে চাইছি। প্রশ্নটা এই ধরনের : বিশ্বের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব প্রান্তের সমস্ত সমাজে পরম্পরাগত স্থানীয় সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা যেন লুপ্ত হয়ে এসেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুর্দান্ত অগ্রগতির ফলে এবং সেইসঙ্গে বিপণন ব্যবস্থার অভাবনীয় সম্প্রসারণের ফলে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের দ্রুত পশ্চাদপসরণ ঘটছে আর তার স্থান অধিকার করছে আধুনিক নামধারী এক কৃত্রিম ও বায়বীয় চরিত্রের তথাকথিত বিশ্বসংস্কৃতি। এ-রকম ক্ষেত্রে লোকগীতাদি লোকসংস্কৃতির উপাদান নিয়ে মাথা ঘামানোর কিংবা সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সার্থকতা আছে কি?

এর উত্তর দৃঢ়তার সঙ্গে এককথায় দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন এক অদমনীয় জীবনীশক্তি আছে যার সাহায্যে সে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং অনেক সময়ে মৃতপ্রায় উপাদানও ফিনিক্সের মতো নিজেকে পুনর্জীবিত করে। আজকের আধুনিকতার প্রবল স্রোতের মধ্যেও শুধু অনগ্রসর বিকাশশীল সমাজের জন্যই নয়, এমন-কি অগ্রসর ও বিকশিত সমাজ সহ সমগ্র মানব-সমাজের জন্যও, লোকসংস্কৃতির সম্পদগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আমি এখন সেটাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব সমাজের শুভচিন্তক দুজন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে। প্রথমজন হচ্ছেন আমেরিকান লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত Alan Lomax যাঁর Folksong Style And Culture নামক গ্রন্থের উল্লেখ আমি একটু আগেই করেছি। আর অন্যজন হচ্ছেন ভারতীয়, অসমিয়া— আধুনিক অসমের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসাধক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা।

প্রথমে Alan Lomax-এর কথা বলা যাক। ইতিমধ্যে উল্লেখিত ১৯৭২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির এক জায়গায় তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসী আক্রমণ এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির দুর্বল সংস্কৃতিকে পদদলিত করে নিশ্চিহ্নকরণের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলে কীভাবে পৃথিবী থেকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই পরিস্থিতি সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এক আতঙ্কময় ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। আমরা এমন এক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে নেই কোনো বিচিত্রতা, নেই কোনো বর্ণিলতা, নেই কোনো বিকল্প আশ্রয়— আছে শুধু এক বর্ণহীন, স্বাদহীন, কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ সমরূপতা। এই বিশ্বটি বাসযোগ্য বিশ্ব হয়ে থাকবে তো? লোকসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য অনুভবকারী সমস্ত সচেতন মানুষেরই প্রশ্ন এটাই। Lomax-এর নিজের ভাষায় :

"To a folklorist the uprooting and destruction of traditional cultures and the consequent grey-out or disappearance of human variety presents as serious a threat to the future happiness of mankind as poverty, overpopulation, and even war. ...Soon there will be nowhere to go and nothing worth staying at home for. War is wasteful of lives, but only rarely and at its most dreadful does it eradicate a whole way of life. ...Our Western mass production and communication systems are inadvertantly destroying the languages, traditions, cuisines and creative styles that once gave the people of every locality a distinctive character."

সেটা ছিল ১৯৭২ সালের কথা। আর প্রায় একই ধরনের কথা জ্যোতিপ্রসাদও বলেছিলেন তারও অন্তত কুড়ি বছর আগেই।

অসমিয়া সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টাকে প্রাদেশিকতার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিতকরণপ্রয়াসী অভিমত খণ্ডন করে জ্যোতিপ্রসাদ বলিষ্ঠতার সঙ্গে বলেছিলেন যে বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষার খাতিরে এইরকম চেষ্টা শুধু সমর্থনযোগ্যই নয়, এমন-কি অপরিহার্যও। 'অসমিয়া স্থাপত্যর নব রূপ' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন :

"আজ আমরা আমাদের আপন বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য এক বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়তে এগিয়ে এসেছি। সেই কারণেই বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে আমরা আমাদের অসমিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষার্থে যে-চিন্তা বা কাজ করব তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা হতে পারে না।"

(*"আজি আমি আমার ঘরুয়া বৈচিত্র্য রক্ষা করিবলৈ এটা বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ আগ বাঢ়ি ওলাইছোঁ। সেই কারণেই বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষা করিবলৈ আমি আমার অসমীয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষা করিবলৈ যি চিন্তা বা কর্ম করিম সি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা হ'ব নোয়ারে।"*)

আরও একধাপ এগিয়ে জ্যোতিপ্রসাদ বলেছিলেন :

"... এই বিশ্ববৈচিত্র্যের ভাবধারায় সকল জাতি, মহাজাতি, উপজাতি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়তে এগিয়ে এলে সেখানে আর সংঘর্ষের স্থান কোথায়? সেটা হলেই বাঙালি বা মারাঠিরা যেমন নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাটা কর্তব্য বলে ভাববেন তেমনই অন্যদিকে তাঁদের যে অসমিয়া সংস্কৃতিও রক্ষা করতে হবে সেই কর্তব্যও উপলব্ধি না-করে পারবেন না। অসমিয়া সমতলবাসীরাও তখন আমাদের অসমের উপজাতিদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রক্ষা করতে হবে সেটাও ভালো করে বুঝতে পারবেন।"

("... *এই বিশ্ববৈচিত্র্যবোধর ভাবেরে সকলো জাতি, মহাজাতি, উপজাতিয়ে নিজর সভ্যতা-সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ আগ বাঢ়িলে তাত আরু সংঘর্ষর ঠাই ক'ত? তেতিয়া হলে বঙালী বা মারাঠীয়ে যেনেকৈ নিজর সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাটো কর্তব্য বুলি ভাবিব আনফালে তেওঁলোকে যে অসমীয়া সংস্কৃতিকো রক্ষা করিব লাগিব সেই কর্তব্যও উপলব্ধি নকরি নোয়ারিব। অসমীয়া ভৈয়মীয়াসকলেও তেতিয়া আমার অসমর জনজাতিসকলর সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রক্ষা করিব লাগিব সেই তাকো বুজিব পারিব ভালকৈয়ে।*")

এমন-কি জ্যোতিপ্রসাদ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির স্বপ্নও দেখেছিলেন :

"বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্যবোধ থাকলেই লোকে যাকে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ বলতে চায় তা আর কী করে থাকবে? বিশ্বশান্তির পথও এই দিক দিয়েই।"

(*"বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্যবোধ থাকিলেই যাক সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ লোকে বুলিব খোজে সি আরু কেনেকৈ থাকিব? বিশ্বশান্তির বাটো এই ফালেদিয়েই।*")

জ্যোতিপ্রসাদের এই উক্তিগুলির সূত্র ধরে একটু আগে প্রকাশ্যে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর আরও একবার নতুন ধরনে খুঁজতে পারি।

প্রশ্নটি ছিল : আজকের globalization বা গোলকায়নের যুগে লোকগীতাদি স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সার্থকতা আছে কি?

আমাদের উত্তরটা হবে এই ধরনের : গোলকায়ন আর বিশ্বায়ন বা বিশ্বমুখিতা এক বস্তু নয়। আবার প্রকৃত বিশ্বায়নের অর্থ একবর্ণী সমরূপতা নয়, বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সহ-অবস্থান ও সহমর্মিতাই। এর মধ্য দিয়ে যেভাবে অঞ্চলগত ও গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলা সম্ভব, তেমনই মানবকুলের জন্য একান্ত কাম্য অথচ এখন পর্যন্ত সুদূরপরাহত বিশ্বশান্তির সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে।

আমার বক্তৃতার এখানেই অন্ত পড়ছে। আপনাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ❑

[এই নিবন্ধের 'প্রস্তাবনা' অংশের অনুবাদ স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক কৃত]

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

বর্তমান বছরের রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতার বিষয় স্থির হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা। উত্তর-পূর্বাঞ্চল বলতে বোঝানো হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত (North-east India)। বক্তব্যের শুরুতেই বলা প্রয়োজন 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' নামে আমার একটি গ্রন্থ আছে, যার দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০০২ ও ২০০৬ সালে। প্রথম খণ্ডটির আবার পরিবর্ধিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর ডিসেম্বরে। উক্ত গ্রন্থের দুটো খণ্ডেই আমি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা কবিতা নিয়ে সাধ্যমতো আলোচনা করেছি। সুতরাং আজকের এই বক্তব্যে তেমন নতুন করে বলার কিছু নেই, বরং রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত বক্তৃতার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশিত গ্রন্থের বক্তব্যকেই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। যাঁরা গ্রন্থ দুটি পড়েছেন তাঁদের কাছে আজকের বক্তব্য হয়তো পুনরাবৃত্তিই মনে হবে সন্দেহ নেই।

কেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে এই আলোচনা :

আমাকে যে-অঞ্চল নিয়ে বলতে বলা হয়েছে তাকে আমি তিন দশকেরও কিছু আগে (১৯৮০) 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন' বলে চিহ্নিত করেছিলাম। সে-সময়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম : "বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রাজধানী কলকাতা। সাহিত্যের রথী মহারথীরা প্রায় সকলেই কলকাতার বা তার আশপাশের বাসিন্দা। কলকাতার বাইরেও একটি স্বীকৃত বলিষ্ঠ ধারা রয়েছে বাংলাদেশে। দুই দেশের সাহিত্যের স্বাদও আলাদা। পেশাদার প্রকাশক কিংবা সমালোচকদের দ্বারা এখন পর্যন্ত তেমনভাবে স্বীকৃত না হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যের যে 'তৃতীয় ভুবন' বর্তমান তাও উপেক্ষণীয় নয়।"[১] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন কথাটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন — অনেকে আবার বিরোধিতা করে বললেন যে এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ পাচ্ছেন। তখন আমাকে 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন' নাম দিয়ে আলাদা একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় যা ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় গুয়াহাটির 'প্রাসঙ্গিক' পত্রিকায়, পরে আলাদা পুস্তিকা হিসেবেও প্রকাশ পেয়েছে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়।[২] উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করে লিখলাম — "সাতচল্লিশের স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগ বাংলা সাহিত্যের ভুবনকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দিল। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিশাল রাজনৈতিক দেওয়াল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগৎ ভাগ হয় দুটি প্রধান ভাগে, যাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ভুবন বলে চিহ্নিত করি। এই দুই ভুবনকে মেনে নিতে পাঠক কিংবা সমালোচকদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই দুই ভুবনের বাইরেও নানাবিধ বাস্তব কারণে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে বাংলা সাহিত্যের একটি জগৎ গড়ে উঠেছে তার খবর এখনও অনেকের কাছে পৌঁছোয়নি। দুই স্বীকৃত ভুবনের বাইরে বাংলা সাহিত্যের এই জগৎকেই আমরা বলি বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন।" লিখেছিলাম — "তৃতীয় ভুবন একটি বাস্তব সত্য—আমরা কোনো প্রস্তাব নিয়ে একে তৈরী করিনি, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণেই

তা গড়ে উঠেছে— আমরা কেবল তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছি— এই পর্যন্ত।" তৃতীয় ভুবন শব্দবন্ধ ব্যবহার না-করলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা সে-কথার স্বীকৃতি আজকের এই বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন সত্যটা মেনে নিয়ে এমন বক্তৃতার আয়োজন করেছেন, এ খুব আনন্দের কথা।

এই তৃতীয় ভুবন কথাটা চালু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে ঢাকার 'আবহমান' নামক একটি বিখ্যাত পত্রিকায় কলকাতার বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর অন্যতম লেখক কলিম খান তাঁর 'আনিলাম অপরিচিতের নাম'[৩] প্রবন্ধে বাংলা ভাষার এই বিভিন্ন ভুবন তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করে লিখলেন: "আজ আমাদের বাংলা ভাষা পঞ্চভুবনে পরিব্যাপ্ত— (এক) পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির জগৎ, (দুই) বাংলাদেশের বাঙালির জগৎ, (তিন) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালির জগৎ, (চার) ভারতের বাকি অংশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালির জগৎ ও (পাঁচ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রবাসী বাঙালির জগৎ। সব মিলিয়ে ২৪ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পঞ্চভুবন। লক্ষণীয় যে তৃতীয় ভুবন (হাইলাকান্দির বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলা ভাষার তৃতীয় ভুবন নামে শনাক্ত করেন। মনে রাখা দরকার, তাঁদের মোট চৌদ্দজন তরুণ তরুণী— ১৯৬১ সালের ১৯শে মে, ১৯৭২ সালের ১৭ই আগস্ট, ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই তারিখে বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন।) উত্তর-পূর্ব ভারত এখন ত্রিপুরা সহ সাতটি রাজ্যে বিভক্ত ... বাংলা ভাষার যা কিছু উত্তরাধিকার ও দক্ষিণাধিকার তা-সবের স্বাভাবিক অধিকারী এই পঞ্চভুবন। ... উত্তরাধিকার বলতে বাংলাভাষার এ যাবৎ অর্জিত সম্পদের ধারণ ও বহন করে নিয়ে চলার অধিকার ও দক্ষিণাধিকার বলতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যতের অর্জনের অধিকার, সৃজনের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে।"

এই পঞ্চভুবনে ব্যাপ্ত যে-বাংলা কবিতা, তারই যোগফলে অখণ্ড বাঙালির, বাংলা কবিতার পরিচয়। তবে সমস্তকে একসঙ্গে দেখতে গেলে তার প্রতিটি ভুবনের পরিচয় তন্ন তন্ন করে জানতে হয়, কাউকে কম কাউকে বেশি গুরুত্ব দিলে চলবে না। হতে পারে, যে যাকে জানে সে তাকে উপস্থিত করুক, আর এইভাবে লোকসমাজে, পাঠকসমাজে উপস্থিত হোক পঞ্চভুবন। এক বছর আগে এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতায় আমরা প্রথম ভুবনের বাংলা কবিতার পরিচয় পেয়েছি, আমার আজকের বক্তৃতার বিষয় কেবল তৃতীয় ভুবনের, অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা। এ এক পরিপূরক বক্তব্যের প্রয়াস মাত্র— তার বেশি কিছু দাবি করি না।

২

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন এই যে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' কিংবা বাংলাদেশের বাংলা কবিতা, চতুর্থ ভুবনের বা বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতা এ-সব কথা কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের। স্বাধীনতার আগে অতুলপ্রসাদ সেন, বনফুল, জসীমউদ্দিন কিংবা বৃহত্তর ত্রিপুরার দীনেশচন্দ্র সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুরমা উপত্যকার দেবীযুদ্ধের শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, অশোকবিজয় রাহা, রসময় দাশ সকলেই বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দেরই মতো ছিলেন কেবল বাংলা সাহিত্যের লেখক কিংবা কবি। প্রবাসী বাঙালি ছিল— কিন্তু প্রবাসী বাঙালির সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের সাহিত্য, বহির্বঙ্গের সাহিত্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য কথাগুলো একে একে এল। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা কথাটা একান্তই দেশবিভাগ-পরবর্তী— আমিও তাই আমার আলোচনা সীমিত রাখতে চাই দেশবিভাগ-পরবর্তী কালের কথায়। আবার শেষ সীমাও টানছি গত শতাব্দীর শেষ, অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত। বর্তমান শতকে এই অঞ্চলের বাংলা কবিতার যে-বিস্তার ঘটেছে, যে-নতুন অর্জন এসেছে তার আলোচনার জন্য বোধহয় আরও কিছুটা কাল অপেক্ষা করা উচিত। যাঁরা নতুন এলেন, তাঁরা কে কতদিন লিখবেন, কে-বা সরে পড়বেন তা জানার জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন।

৩

আমরা জানি বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে একটা বিশেষ সাহিত্যই গড়ে উঠতে পারে। ভাষাচর্চাই হোক কিংবা সাহিত্যচর্চাই হোক তা স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। আবার এও সত্য যে একটি ভাষায় একটিই সাহিত্য হয়, তাই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য তার বিশেষ বিশেষ স্থানের ও কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই বাংলা সাহিত্য। অখণ্ড বাংলা সাহিত্যই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যের পঞ্চভুবনে। এক অখণ্ড

বাংলা-সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা যখন আজকের দুয়ারে উপস্থিত, তখনও জানি সাহিত্যের বিচারে স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। একই ভাষার সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণের বাইরেও বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে কিছু বিশেষ লক্ষণ ধরা পড়ে, যা তার আঞ্চলিক অর্জন। আবার পাত্র বিশেষেও অর্জনের কিংবা বিচারের তারতম্য ঘটে।

আমাদের এই ভুবনের বাঙালির কাব্য-সাহিত্য চর্চার পেছনে রয়েছে তাদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, সাহিত্যচর্চা এখানে কারও কাছে জীবিকার পথ নয় এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সময়েই লোকসানের ব্যাপার। শুধুই মানসিক প্রাপ্তির কথা ভেবে, কেবলই অন্তরের তাগিদে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে দিনের পর দিন সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার কথা সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের পেশাদার সাহিত্যিকরা বর্তমানকালে ভাবতেই পারবেন না। এই সীমাহীন নিষ্ঠা ও ভালোবাসার পেছনে অর্থকরী কোনো দিক যেমন নেই, তেমনই বাংলা সাহিত্যের দরবারে খ্যাতির আসন লাভের আশু আশাও তেমন নেই, আছে কেবল ভাষার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আর এক জরুরি সংগ্রাম— বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরিকল্পিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যোগ দিয়ে যেমন এ-অঞ্চলের বাঙালিকে বারবার শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, তেমনই করতে হচ্ছে শত শত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ভাষার সুরক্ষা এবং নবতর অর্জনের প্রয়াস।

হ্যাঁ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিন নির্ভর, যেমন চতুর্থ ভুবনের সাহিত্যচর্চাও। পশ্চিমবাংলায় এবং বাংলাদেশেও সাহিত্যচর্চায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবল নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত পত্রপত্রিকা এবং বড় বড় প্রকাশন সংস্থার পাশাপাশি চলছে লিট্‌ল ম্যাগাজিন— আর চলতে চলতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটা অংশ নিয়মিত মিশে যাচ্ছে বাণিজ্যিক স্রোতে। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাশে লিট্‌ল ম্যাগাজিন। হালে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে কিছুটা হাত বাড়াতে চাইলেও তারা কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মূল স্রোতকে প্রভাবিত করার মতো শক্তি এখনও সঞ্চয় করতে পারেনি। আমাদের আলোচনাও তাই এগিয়ে চলবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আন্দোলনের এগিয়ে চলার পথ ধরে।

তৃতীয় ভুবনের, অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য চর্চায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক তার কবিতা। দেশ বিভাগের আগে, যখন এ-অঞ্চল প্রধান বঙ্গভাষী অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক দেওয়ালে বিচ্ছিন্ন ছিল না, তখনও সৃষ্টিশীল রচনার বিচারে এ-অঞ্চলের কাব্যচর্চাই ছিল সম্ভবত অধিক উন্নত। যদিও এ-অঞ্চলের গদ্যচর্চার ইতিহাসও উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গদ্যের চর্চাও কবিতা-চর্চারই মতো বহু প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। তবে কবিতার কথায় দেখি ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪৩১-১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ) আদেশে 'রাজমালা' নামক আখ্যানকাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত কিংবা রচিত হয়েছিল। এই আখ্যানকাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্যেরই নিদর্শন। বাংলা কাব্যচর্চায় কাছাড়ের রাজ-পরিবারেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট কবিকে পাচ্ছি— তাঁরা হলেন ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন, মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র ধ্বজ নারায়ণ, চন্দ্রমোহন বর্মন, রামকুমার নন্দী। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য, বীরচন্দ্র-দুহিতা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী— কবি হিসেবে এঁরা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র, অনঙ্গচন্দ্রও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক এই দুই রাজ-পরিবারের মাতৃভাষা বাংলা ছিল না, যদিও বাংলাকেই তাঁরা রাজকার্যের কিংবা সাহিত্যচর্চারও বাহন করে নিয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে উক্ত রাজ্যদ্বয়ের রাজারা নিজেদের রাজ্যকে বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্য বলে মানতেন।[৪] প্রজাদেরও অধিকাংশ ছিলেন বঙ্গভাষী।

কিন্তু এ-সব তো স্বাধীনতার আগেকার কথা। স্বাধীনতার পরে এল উলটোরথের পালা। ভারতে স্বাধীনতার জন্য যে-বাঙালি জাতি সবচেয়ে বেশি প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, স্বাধীনতা আর দেশভাগ সেই বাঙালির জীবনকে একেবারে তছনছ করে দিল। ভারতে আর-কোনো ভাষার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য এত মূল্য দিতে হয়নি। একটু আগেই বলেছিলাম এ-অঞ্চলে বাংলা ভাষা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল রাজ-আমলে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে একমাত্র ত্রিপুরা বাদ দিলে বাংলা ভাষার উপর নেমে এল নতুন রাজার আক্রমণ, প্রতিরোধ-আন্দোলনে শহিদ হতে হল আসাম রাজ্যে বাঙালিকে বার বার

তিনবার। এই পরিবর্তিত পরিবেশে, রাজ-আনুকূল্যের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের উদাসীনতায় বারবার ভ্রাতৃঘাতী আক্রমণের মোকাবিলা করে বাঙালি যে নতুন ভুবন আবিষ্কার করল তার প্রভাব পড়ল সাহিত্যচর্চার, কবিতাচর্চার জগতেও।

স্বাধীনতার পরবর্তী এক-দেড় দশকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠুক, আসামের বাঙালি কবিরা কিন্তু ভাবলেন একটু অন্যভাবে। তাঁদের আন্দোলন হল বাংলা ভাষার মূল স্রোতে এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতাকে ধরে রাখার প্রয়াস। উন্নত সাহিত্যচর্চাই রক্ষা করবে ভাষাকে— কাজেই কোনো উত্তেজনার ফাঁদে পা না-দিয়ে এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা কাব্যচর্চাকে এতটা উন্নত করতে হবে যে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে এটাই হবে এক প্রধান হাতিয়ার।

স্বাধীনতার পরবর্তী দু-দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এত সাহিত্য-পত্রিকা বেরিয়েছে যার প্রকৃত হিসেব রাখা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এইসব পত্রপত্রিকার অধিকাংশই যে কবিতা-প্রধান ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অসংখ্য পত্রপত্রিকার বিরাট অংশই ছিল চরিত্রে ওষধি, আর অনেক কবিও বছর দু-বছর লিখে যে-যার স্টেশনে নেমে পড়েছেন। যাঁরা ছিলেন সামনে তাঁরা অনেকেই রয়ে গেছেন পেছনে, কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে এগিয়ে দিয়েছে কবিতাকে। সৎ সাহিত্য-পত্রিকার অভাব এবং কলকাতার পত্রপত্রিকার নিদারুণ উপেক্ষা অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে; প্রচণ্ড অভিমানে অনেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, কেউ-বা পাড়ি দিয়েছেন কলকাতায় আর কিছু কিছু অত্যুৎসাহী কবি ও গল্পকার সমস্ত বাধাকে অবহেলা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্যকে, বিশেষ করে বাংলা কবিতাকে আজকের স্তরে নিয়ে এসেছেন। আজকের বাংলা কাব্যের যে-কোনো সংকলন খুললেই দেখা যাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই এখানকার সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণেরা এখন আর কলকাতায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পালাই-পালাই করেন না— যা দেখা গিয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম দশকে। আর এই আশ্চর্য ঘটনা প্রধানত ঘটেছে প্রথমত কাছাড়ের ও ত্রিপুরার কিছু সাহসী কবিগোষ্ঠীর কবিদের হাত ধরে মূলত ষাটের দশকে। যদিও আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই।

বৃহত্তর আসামে কাছাড়ের বাইরে প্রধানত শিলং, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড়ে পঞ্চাশের দশক থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনেক সাহিত্যপত্র। নিছক কবিতার জন্য না-হলেও সেগুলোকে আশ্রয় করেই কাব্যচর্চা করছিলেন এই অঞ্চলের কবিরা, কিন্তু সে-সব অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত শহিদের ভূমিকা নিয়েছে। তৎকালীন গৌহাটির 'সপ্তপর্ণ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র দীর্ঘজীবী হলেও আসামে বাংলা কাব্যচর্চায় তার ভূমিকা গৌণ। ডিব্রুগড় থেকে বেরিয়েছিল 'সংবর্ত', সম্পাদক ক্ষিতীশ রায় আর ঊর্ধ্বেন্দু দাশ। অতি উঁচুমানের এমন একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন এ-অঞ্চলে খুব কম ছিল— আর সেই পত্রিকা ঊর্ধ্বেন্দু দাশের মতো একজন শক্তিশালী কবিকে উপহার দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। ক্ষিতীশ রায়ও একসময় কবি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত শিলঙে একটির পর একটি তরঙ্গ এসেছে। 'সংঘাত' (কবিতা-প্রধান) সম্পাদক ছিলেন বিমল সেনগুপ্ত; নৃপতিধর চৌধুরী এবং পরাগ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রথম পরিচয়'; অমৃতলাল বিশ্বাস, সুভাষ দাশগুপ্ত প্রমুখ চার সম্পাদকের 'সীমান্তের কথা'। ১৯৬১-র রবীন্দ্র-জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিমাসিক 'মুরজ'— বেণুমাধব গোস্বামী, কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য আর আমার সম্পাদনায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শক্তিমান কবি বিশ্বপতি গুপ্ত। বিশেষ করে বিশ্বপতি অনেক স্মরণীয় কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য শেষ কিছুদিন মুরজ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮-র আগে বেরিয়েছিল 'উৎস' (সাইক্লোস্টাইল করা) যার অন্যতম কবি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি। আসলে সে-সময়ে শিলং ছিল আসামে বাংলা সাহিত্য চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র।

এবার বলি কাছাড় অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকার কথা। ষষ্ঠ দশকের শেষার্ধ থেকে কাছাড় জেলায় পত্রপত্রিকার জোয়ার এসেছিল। অসংখ্য নতুন কবি, নতুন কবিতা। করিমগঞ্জ থেকে 'কিশোর', 'উজ্জীবন', 'আলো', 'নবভারতী', 'কাকলি', 'ফলক', 'পদক্ষেপ', 'স্বাক্ষর', 'পথনির্দেশ'; শিলচর থেকে 'অগ্রদূত', 'নতুনপত্র', 'সঞ্চার', 'দিগন্ত', 'মালঞ্চ', 'নবপল্লব', 'রূপান্তর', 'আভাষ', 'আলোক', 'ইশারা', 'সম্ভার', 'লুব্ধক', 'বরাক' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা যেন প্রচণ্ড জীবনীশক্তি নিয়ে পরবর্তী গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল। সেকালে কলেজ-ম্যাগাজিন এবং স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহের সাহিত্য-সাময়িকীর ভূমিকাও

উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শুধু কবিতার জন্য হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত হল 'স্বপ্নিল' (১৯৫৭), করুণাসিন্ধু দে আর ত্রিদিব মালাকারের সম্পাদনায়। স্বপ্নিল সারা আসামে কেবল কবিতার জন্য প্রথম পত্রিকা মাত্রই নয়, প্রথম যথার্থ আধুনিক কবিতার পত্রিকা।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন আসামে (আসাম বলতে এ-প্রবন্ধে বৃহত্তর আসামের কথাই বলা হচ্ছে— স্বাধীনতার পরে যেমন পেয়েছিলাম, আজকের খণ্ড-বিখণ্ড আসাম নয়) পত্রপত্রিকার জোয়ার এসেছিল। তখন একটু অন্যভাবে ত্রিপুরায় চলছিল বাংলা সাহিত্য চর্চা। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আসাম থেকে প্রকাশিত ছোট পত্রিকার তালিকা করতে গিয়ে একশোরও বেশি পত্রিকার নাম পেয়েছিলাম।

ষাটের দশকের কাছাড় কাব্য-আন্দোলনের আগেও আসামে আমরা বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে পেয়েছিলাম, যাঁদের কেউ কেউ দেশ বিভাগের বেশ আগেই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কেউ শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশকেই। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, অশোকবিজয় রাহা, রসময় দাস, পরমানন্দ সরস্বতী, দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সুধীর সেন, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস, অতুলরঞ্জন দেব, মনোজিৎ দাস, সরোজ বিশ্বাস, মণীন্দ্র রায় (অনুজ), আশুতোষ গিরি, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, দেবরঞ্জন ধর প্রমুখ। 'স্বপ্নিল'-এর কথা তো বলেছি— সেখানে আবির্ভাব ঘটেছিল ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহেরও। এঁদের অনেকেই কলকাতা পাড়ি দিলেন, প্রতিষ্ঠিত হলেন বাংলা কাব্যের প্রধান জগতে। এ-অঞ্চলে যাঁরা রইলেন তাঁদের আশ্রয় করে কিন্তু কোনো কাব্য-আন্দোলন কিংবা ভালো ছোট পত্রিকাও জন্ম নিল না। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কাছে শুনেছি সে-সময়ে (পঞ্চাশের দশকে) কাছাড়ের কবিদের আলোচনায় শোনা যেত 'বিষ্ণু দে যেন কেমন কেমন।' অর্থাৎ ভালো করে রবীন্দ্রপ্রভাব কাটেনি তখনও। তেমন পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হল ষাটের দশক অব্দি।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি স্বপন সেনগুপ্ত ত্রিপুরার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন— "রাজ আমলে ত্রিপুরা ছিল স্থির দিঘির মতো শান্ত, জীবনযাত্রা ছিল স্নিগ্ধ। আগরতলায় ছিল রাস, হোলি, ঝুলনের উৎসব-মুখরতা। চারদিকে বৈষ্ণব গন্ধমাখা নাম ধাম। যেমন রাধানগর, কৃষ্ণনগর, বনমালীপুর। রাজ অন্তঃপুরে রাজপুরুষেরা, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, কুমুদিনী, মৃণালিনী, কমলপ্রভারা যখন রবীন্দ্রানুকরণে ব্যস্ত এবং কিছুটা সময়ের ব্যবধানে অজিতবন্ধু দেববর্মা, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নুরুল হুদারা যখন সাহিত্যচর্চা করছেন তখনও মোরামের রাস্তা ছিল, গ্যাসের বাতি জ্বলত, ঘোড়ার গাড়ি ছিল যানবাহন। বুনো হাতি নামত শহরে— টিন বাজাত আর মশাল জ্বেলে রাখত এই গণ্ডগ্রাম আগরতলায়।

"স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তর, দাঙ্গা, বিলিতি পণ্য পোড়ানো, এ সব কোনো কিছু এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো প্রভাবও পড়েনি রাজ আমলের এই ত্রিপুরায়।"

এই ত্রিপুরা ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে ভারতে যোগ দিল। ওদিকে দেশভাগের পরে-পরেই, রাজার জমিদারি সমতল ত্রিপুরা জেলার ছিন্নমূল মানুষেরা রাজার আশ্রয়ে এসে গেছেন বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরায়— এবং এদের নিয়েই ত্রিপুরা যোগ দিল ভারতে। এই ত্রিপুরার 'পূর্বাশা' পত্রিকা, কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্যেরা বাংলা কাব্যজগতে পরিচিত নাম। সমতল ও পার্বত্য ত্রিপুরার মিলনে সেই শান্ত ত্রিপুরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল। ত্রিপুরার বাংলা কাব্যচর্চায় এল নতুন মুখ। সেই সময়ে বর্তমান ত্রিপুরার লেখকরা সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই সাহিত্যসাধনা করতেন। পূর্ণাঙ্গ কোনো সাহিত্য-পত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন তখনও প্রকাশিত হয়নি। ত্রিপুরার যা সাহিত্য-ঐতিহ্য তা ছিল সেই অংশে যা চলে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক বাঙালি চলে এলেন পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে— তারপর রাজ্যটা এল ভারতে— শুরু হল সবকিছু নতুন করে। ১৯৫২-র ১১ ফেব্রুআরি ত্রিপুরার প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা 'সমীক্ষা' প্রকাশিত হল। 'সমীক্ষা' অবশ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছিল না, ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা, আর সেটাই উপহার দিয়েছিল বিমল চৌধুরীর মতো এক অসাধারণ আধুনিক গল্পকারকে। তবু আমরা দেখি, যখন কাছাড়ে, শিলঙে ছোট পত্রিকার বান ডেকেছে সেই পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরায় মাত্র তিনটে পত্রিকার সন্ধান মেলে। 'সমীক্ষা' (১৯৫২), 'গোমতী' (১৯৫৮) আর 'গ্রন্থলোক' (১৯৫৯)।

আমার আলোচ্য সময়কালে, গত শতাব্দীর শেষ পাঁচটি দশকে (১৯৫১-২০০০) বাংলা কবিতায় অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে

ত্রিপুরার একটা ফারাক চোখে পড়ে। সর্বত্রই আমরা দেখি, নতুন কবিরা তাঁদের নতুন নতুন লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে আসরে উপস্থিত হয়েছেন এবং কিছুদিন এইভাবে ছোট পত্রিকায় লেখার পর, প্রকাশিত কবিতা থেকে বাছাই করে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা গোষ্ঠীগত ভাবে কবিতা-সংকলন প্রকাশ করছেন (একমাত্র ব্যতিক্রম শিলচর থেকে প্রকাশিত মণীন্দ্র রায় ও শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত কাব্য-সংকলন 'অরণ্যপুষ্প')। ত্রিপুরার ধারাটা কিছুটা উলটো। নবীন-প্রবীণ কবিরা তো কবিতা চর্চা করছিলেনই, কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য ছোট পত্রিকা প্রকাশের আগেই দেখি একসঙ্গে অনেক কবির কবিতা নিয়ে কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হল। ১৯৬১ ('৬২?) সালে এল প্রথম কাব্য-সংকলন 'প্রান্তিক', খগেশ দেববর্মন এবং সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের সম্পাদনায়। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হল কাব্য-সংকলন 'এক আকাশ তারা'— সম্পাদক প্রবীর দাস এবং শ্রীবাস ভট্টাচার্য। দুটি সংকলনে আমরা পেলাম কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে, তাঁরা রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী আর সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন। আরেক তরুণ কবিকে আমরা পেয়েছিলাম যিনি পরবর্তীকালে বহু-আলোচিত হাংরি জেনারেশনের অন্যতম সদস্য প্রদীপ চৌধুরী।

আগেই বলেছি, গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে, যাকে ইংরেজির অনুকরণে ষাটের দশক বলতে আমরা অভ্যস্ত, বাংলা কবিতার ভুবন কলকাতা-কেন্দ্রিকতার বেড়া ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আসাম ত্রিপুরা উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ বিহার এবং আরও পশ্চিমে। তাই আমরা দেখি, খুব দ্রুত পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে ত্রিপুরার বাংলা কবিতাও বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় মিশে যায়। আমি বলব, যেমন বৃহত্তর আসাম, তেমনই বৃহত্তর ত্রিপুরায়ও অর্থাৎ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা কাব্যচর্চায় গত শতাব্দীর ষাটের দশক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশক। একসঙ্গে এত বেশি ভালো লিট্‌ল ম্যাগাজিন, এত বেশি উল্লেখযোগ্য কবি, ব্যতিক্রমী ও সাহসী কবি আমরা আর কখনো পাইনি। এই কবিরা বাংলা কবিতায় তাঁদের সমসাময়িকদেরই সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। এবং আজও তাঁরা অনেকেই বাংলা কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

৪

'সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৬৭) শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছেন, "কাব্য আন্দোলনের একটা সহজ সংজ্ঞা যদি এই দেয়া যায় যে, কয়েকজন কবি একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে কবিতা লিখছেন, পাঠকের মনে তাঁদের কবিভাব সঞ্চারিত করবার জন্য মুখপত্র প্রকাশ করছেন, কিংবা কবিতার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঋতুবদলের চেষ্টা করছেন এবং সর্বোপরি কাব্য বিষয়ে 'এটা-সেটা' নিয়ে প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করছেন; তাহলে বলতেই হয় ১৯৬০-এর পূর্ব পর্যন্ত কাছাড়ে কোনো কাব্য আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না।... বহু আগেই এ অঞ্চলে একাধিক প্রকৃত অর্থে ভালো কবি ছিলেন। কিন্তু তখনকার কবিদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধতা ছিল না, যাঁরা লিখতেন, আপন মনেই লিখতেন।" অথচ এই গোষ্ঠীবদ্ধতা ছাড়া, সে-কালে, কলকাতার বাইরে কোনো কবির বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু গোষ্ঠীবদ্ধতায় সম্ভব কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা। আর নিয়মিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন না-থাকলে দুরন্ত অভিমানে কবি-গল্পকাররা যে প্রত্যহ কবিতাহীন জগতে, সাহিত্যহীন জগতে নির্বাসিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

তখন আমরা যাঁরা লিখতে এলাম, এ-সব কথা মাথায় ঘুরত। আরেকটা কথা, আসাম সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্যভাষা হিসেবে সারা আসামে চাপিয়ে দেবার আইন করায় আমরা বুঝলাম, আসামে বাংলা ভাষায় উন্নত চর্চার জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে। শিলং থেকে ১৯৬১-র ৮ মে (পঁচিশে বৈশাখ) আমরা দশ-বারোজন সহপাঠী বন্ধুবান্ধব মিলিত হয়ে প্রকাশ করলাম দ্বিমাসিক 'মুরজ' (প্রথম সংখ্যার নাম ছিল 'মৌসুমী রাগ')— যার প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'মোদের গরব মোদের আশা আ' মরি বাংলা ভাষা'। ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করতে নতুন রকম লিখতে হয় সেও আমাদের মাথায় ছিল। ওদিকে ডিব্রুগড়ে মিলিত হয়েছিলেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়রা— অসাধারণ এবং নতুন ধরনের কাগজ 'সংবর্ত' নিয়ে। কাছাড় থেকে অগ্রজ কবি সুধীর সেন কবিতা লিখলেন 'মুরজ'-এ, লিখলেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রুচিরা শ্যামেরা। মনে আছে, বিশ্বজিতের একটি কবিতা 'হিরণ্ময় রৌদ্রে যাসনে' পড়ে শিলঙের অনেক অগ্রজ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন— এ আবার কী রকম কবিতা! দুর্বোধ্যতার অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন অনেকে। মুরজে আরও যে-সব কবি যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা বিশ্বপতি গুপ্ত, স্বপন চক্রবর্তী, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ। বছর দুয়েক শিলঙের বাঙালি পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল মুরজ—

তারপর নানা অনিবার্য কারণে আমরা বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম বিভিন্ন অঞ্চলে— মুরজ থাকল না, একা বেণুমাধব গোস্বামী শিলং থেকে পরবর্তীকালে 'রুদ্রবীণা' সম্পাদনা করে শিলঙে কবিতাচর্চাকে জাগিয়ে রাখলেন কিছুকাল।

মুরজ, সংবর্ত-এর বছর দুয়েক পরে কাছাড়ে যে-কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল তার ফল হল সুদূরপ্রসারী। আগে বলেছি, শুধু কবিতার জন্য 'স্বপ্নিল' প্রকাশিত হল হাইলাকান্দি থেকে। কিন্তু স্বপ্নিল-এর কবিরা কলকাতায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁদের গোষ্ঠীও গেল ভেঙে।

মুরজ-এর ঠিক দু-বছর বাদে ১৯৬৩ সালের মে মাসে একদল দুঃসাহসী তরুণ— যথার্থ অর্থে আধুনিক কবিদের মুখপত্র 'অতন্দ্র' প্রকাশ করলেন শিলচর থেকে। "শুধু কবিতার জন্য এই পত্রিকার জন্ম— মন্ত্রের মতো এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে অতন্দ্রের আবির্ভাব।" অগ্রজ কবি সুধীর সেন ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য এই বলে অতন্দ্র-এর পরিচয় দিয়েছিলেন ('কবির শহর শিলচর', 'কবি ও কবিতা' তৃতীয় সংকলন, কলকাতা)। প্রথম বছর দেড়েক অতন্দ্র ছিল পাক্ষিক, পরে অনিয়মিত। অতন্দ্র-এর সম্পাদক ছিলেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী আর উদয়ন ঘোষ। প্রকাশক শান্তনু ঘোষ। অতন্দ্র-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদল কবি 'অতন্দ্র' গোষ্ঠী বলে পরিচিত হয়েছিলেন— যাঁদের আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল কাছাড় কাব্য আন্দোলন, আর বছর পাঁচেক পরে অতন্দ্র-এর কবিরাই মিলে গেলেন 'সাহিত্য'-এ। প্রকৃত বিচারে অতন্দ্র কবিগোষ্ঠীই কবিতা-বিষয়ক নিভৃত চিন্তায়, মেজাজে, শব্দ-ব্যবহারে, প্রতীক কিংবা চিত্রকল্প নির্মাণে, জীবনবোধের গভীরতায় প্রথম আধুনিক। অশ্লীলতা, দুর্বোধ্যতা এবং বিদেশী আমদানির জন্য যেমন কিছু কিছু অগ্রজ কবির তরফ থেকে, তেমনই পাঠকদের তরফ থেকেও নিন্দার ঝড় উঠেছিল। এর আগে বলেছি, মুরজ-এর কিছু কিছু লেখা নিয়েও আমরা বিরূপ সমালোচনা শুনেছিলাম, কিন্তু অতন্দ্র-এর আগে আঞ্চলিক কবিতা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামাতেন না, কিছুটা করুণা মেশানো অবহেলাও হয়তো থাকত। অতন্দ্র-এর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া অতি দ্রুত বদলে গেল। চড়া গলায় নিন্দা ও প্রশংসা শোনা গেল। আমার মনে হয় অতন্দ্র-এর আধুনিকতার এ এক নিশ্চিত প্রমাণ।

১৯৬৩ থেকে '৬৮, এই পাঁচ বছরে অন্তত একশো জন কবিকে অতন্দ্র-তে দেখা গেছে। তবু অতন্দ্র গোষ্ঠী বলে একদল বিশেষ তরুণকে চিহ্নিত করা হয়, নিন্দা কিংবা প্রশংসার লক্ষ্যস্থল এঁরাই এবং এঁরাই আসামের বাংলা কবিতার প্রথম সারির কয়েকজন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোনো স্থির মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা ধীরে ধীরে অতন্দ্র থেকে সরে গেলেন। বর্তমান নাগাল্যান্ডবাসী 'পূর্বাদ্রি' সম্পাদক কবি দেবাশিস দত্তের নাম এভাবেই উল্লেখ করেছেন অতন্দ্র সম্পাদক বিমল চৌধুরী।[৫] সরে গিয়েছিলেন অতীন দাশ, দীনেশলাল রায়, গণেশ দে প্রমুখ। নতুন পত্রিকা করেছিলেন 'শতাব্দী' নামে। অতন্দ্র, শতাব্দী আর সাহিত্য পাশাপাশি চলেছে কিছুদিন। কাছাড় কাব্য-আন্দোলনে শতাব্দীর নামও উল্লেখ করতে হয়।

যা হোক, কবিতা লেখার ভঙ্গি বা চরিত্রে অতন্দ্র-এর কবিরাও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পৃথক— তবু একটা সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। অতন্দ্র কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ অর্থে শুধুমাত্র কবি। এঁদের আছে ক্লান্তিহীন সাধনা, ভালোবাসাহীন যান্ত্রিক পরিবেশে কখনো বিরক্তি, বিদ্রূপ, বিদ্রোহ, কখনো নিদারুণ হতাশা, গভীর বিষাদবোধ। আত্মানুসন্ধানের যন্ত্রণা আর আত্মকেন্দ্রিকতা, গতির জন্য আকুলতা আর সমর্পণের শান্ত ভঙ্গি। এঁদের কেউ কেউ কবিতায় অবচেতনের ভূমিকা অস্বীকার করেন আবার কয়েকজন বিশ্বাস করেন চেতনা আর অবচেতনার বোধ উপযুক্ত প্রতীক, চিত্রকল্প এবং ধ্বনির মাধ্যমে যথার্থ কবিতার জন্ম দেয়। আপাত-অসংলগ্ন চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের কেন্দ্র থেকে যে-জীবন বেরিয়ে আসে তা-ই সম্পূর্ণ। কারও কারও কবিতায় যৌন অনুভূতির গভীরতা চমৎকারভাবে উপস্থিত। লোকগীতি কিংবা পল্লিকবিতা থেকেও সংগৃহীত সার্থক চিত্রকল্প নিবিড় ঐতিহ্য-চেতনারও বাহক মনে হয়। তবু এই কবিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আনীত প্রধান অভিযোগ অশ্লীলতা, দুর্বোধ্যতা আর শিকড়হীনতা। আর ঠিক এইসব কারণেই ষাটের দশকের অতন্দ্র-সাহিত্যের কবিরা কবিতার রহস্যময়তা, বলিষ্ঠতা এবং মাটির গন্ধের অনুভূতি নিয়ে বাংলা কবিতার বৃহত্তর আসরে প্রবেশ করেছিলেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে— যা পারলেন না সেইসব কবি যাঁরা অতন্দ্র-বিরোধী হয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, অতন্দ্র-এর কবিরা দেশী ও বিদেশী প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-আন্দোলন থেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক বোধের সঙ্গে তা যুক্ত করে সমৃদ্ধ করেছিলেন বাংলা কবিতাকে।

"আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন এক যুগে এসে দাঁড়িয়েছি যখন মানবিক সম্পর্কের এক নিদারুণ ভগ্নদশার যুগ— যে যুগ ফাটা দর্পণে নিজের কুৎসিত অবয়বের ততোধিক কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত, সংক্ষুব্ধ, উন্মত্ত এবং কখনও বা অসহায়।" বাঙালি জাতি, বিশেষ করে ধর্মীয় এবং ভাষিক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারদিকের কুৎসিত দৃশ্য দেখে এমনই বোধে পৌঁছেছিল সে-সময়।

আরও মনে হয়েছিল আসামের এই ষাটের কবিদের : সত্য শুধু নিজের জীবনে— কবিতা আত্মকথনমূলক, এখানে আমরা কলকাতা কিংবা অন্য যে-কোনো অঞ্চলের কবিদের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করি। বাংলা কবিতার মূল ধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই— শুধু ছড়িয়ে রয়েছি মাত্র। আর এই ছড়িয়ে থাকার ফলে কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে আমাদের জীবনযাপন কিছু আলাদা। এই সমস্ত আধুনিক চিন্তাভাবনা, উল্লিখিত জীবনযন্ত্রণা নিয়েও আমরা এক বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে একটা শান্ত দিকও খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমাদের প্রেম কিংবা বিষাদ, ক্রোধ, ঘৃণা ও যন্ত্রণার সিঁড়ি ভাঙা, সর্বত্র জড়িয়ে থাকে এখানকার আলো-হাওয়া-রৌদ্র। জীবনের গতিবেগ এখনও এখানে তাল মিলিয়ে তেমন তীব্রতা আনতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাব ঘটেনি, কৃষি-সভ্যতা চলে গেছে। অন্তরঙ্গে যা-ই ঘটুক, আমাদের বহিরঙ্গে ততটা বিদ্রোহ হয়তো ধরা দেয়নি। কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত কী সুন্দর করে লিখলেন সেই কথা—

এই আলো হাওয়া রৌদ্রে চলাচল শুদ্ধ নিয়মে;

... ...

জ্যোৎস্নায় লুটপাট হয়, তবু বালা বসে তো চৌকাঠে,
বুকের আঁচল তার উড়ে যায় যেন এক দিগন্ত ভয়াল;

('সাহিত্য'-১, ১৯৬৭)

এই আলো হাওয়া রৌদ্রের কবিরা স্বকালে এবং স্ব-অনুভূতির কাছে সৎ থেকে নিজেদের কথা বলতে স্বভাবতই চিত্রকল্প এবং প্রতীক রচনায়, শব্দ-ব্যবহারে এবং মেজাজে কিছুটা ভিন্ন হলেন। দেখি এই ভুবনকে :

'মনের মধ্যে খুঁজলে পাবে আমার লেখা চিঠিপত্র'

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়

'বুকের ভেতর তাকালে সই এখনো ঠিক দেখতে পেতে
সেই পুরনো যাদুর বাঁশী বৃষ্টিমুখর কদম্ববন'

- উদয়ন ঘোষ

'তাকাও, যেমন তাকায় কথা মনের ভেতর, দেখতে পাবে
খড়ের ছাওয়া এই চালাঘর, উঠোন এবং স্বচ্ছ বাতাস'

- বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

একই সময়ে লেখা কলকাতা আর আসামের কবিতা— একই তো কথা— অথচ মেজাজে কত আলাদা। দুই ভুবনের যোগাযোগের সূত্র কত আলাদা!

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালির এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য অঞ্চলের বাঙালির থাকার কথা নয়। কিছু বিশেষ শব্দ পর্যন্ত তাকে তাড়া করে অহর্নিশ : বিদেশী, বহিরাগত, ভূমিপুত্র— এ-সব শব্দ কবিকে ভাবায়। ত্রিপুরার স্বপন সেনগুপ্ত ষাটের দশকের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি লিখছেন—

'দৃশ্যত শান্ত আমি, নেই অভিমান
ভিতরে অঙ্গারে লাল অহর্নিশ

... ...

ক্ষোভ কিঞ্চিৎ আছে, ভূমিপুত্র আমি, ওখানেই বিদ্যাভ্যাস
প্রেম ও প্রণয়ে অধীর।'

(ভূমিপুত্র হও, ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী)

যা হোক, ত্রিপুরার কথায় আমি কিছু পরে আসছি। যে-কথা বলছিলাম তা-ই শেষ করি।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আসাম অঞ্চলে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সব পত্রিকার নাম না-বললেও উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর এবং কবিদের কথাও কিছু বলেছি। এ-কথাও বলেছি যে 'অতন্দ্র' পত্রিকার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই অতন্দ্র ১৯৬৮-তে বন্ধ হয়ে যায়। কেন এমন হল? বিমল চৌধুরী লিখছেন, "১৯৬৮ তে আমরা অতন্দ্রের প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। না, অতন্দ্রের অপমৃত্যু হয়নি, রূপান্তর ঘটেছিল।... আসলে... সাহিত্য প্রকাশের পর অতন্দ্রের আর প্রয়োজন ছিল না বলেই আমরা মনে করলাম।" (সাহিত্য-৮৭) আর অন্য সম্পাদক শক্তিপদ বলছেন : "আবেগের দিনের মুখপত্র ছিল অতন্দ্র... অল্পদিনের মধ্যেই— মূলত পদ্যনির্ভর অতন্দ্র গদ্যনির্ভর সাহিত্যে বিস্তৃত হল।... অতন্দ্রকুলের বংশবৃদ্ধি এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করল সাহিত্য।" (শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর চিঠি, সাহিত্য-৮৭) আসলে অতন্দ্র-তে যার উত্তেজনাময় জন্ম ও শৈশব, 'সাহিত্য'-তে তারই ধীর পদক্ষেপে বেড়ে ওঠার

ইতিহাস— আর সে-ইতিহাসের ধারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে আসামে বাংলা কাব্যচর্চার জগতে নিত্য বহমান।

ষাটের দশকে আসামের বাংলা কাব্যচর্চা বাংলা সাহিত্যকে কী দিতে পেরেছে তার দলিল বলা চলে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আসামের নির্বাচিত বাংলা কবিতার সংকলন 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'। যে-গ্রন্থখানাকে মাঝখানে রেখে এপারে-ওপারে বাংলা কাব্যচর্চার দুটি পর্ব। দুই দশকের প্রথম পর্বটি যথার্থ ফসলে পরিপূর্ণ হয়েছিল ষাটের দশকে। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংবাদে সনাতন পাঠক নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "একটি দুর্দান্ত বাংলা কবিতার বই। সত্যিকারের নতুন, সাহসী, সাবলীল ও জোরালো বাংলা কবিতার বই— কবিতাগুলি সম্পর্কে আমার প্রথম সম্ভাষণ : বিস্ময়কর। কাছাড়ে এই যে নবীন কবির দল কবিতা রচনায় মনপ্রাণ অর্পণ করেছেন এঁরা অচিরকালের মধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবার অধিকার রাখেন।... এঁদের প্রত্যেকের নিজস্বতা অনস্বীকার্য।" অর্থাৎ বাংলা কবিতায় এই বিস্ময়কর কাজটি ঘটিয়েছিলেন আসামের, অর্থাৎ মূলত কাছাড়ের অতন্দ্র-সাহিত্য গোষ্ঠীর কবিরা। সংকলনের এই কবিরা হলেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, জিতেন নাগ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, উমা ভট্টাচার্য, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, রণজিৎ দাশ আর মনোতোষ চক্রবর্তী। তবে সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব যাঁকে অবশ্যই যুক্ত করা উচিত ছিল তিনি কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। সে-সময় আমাদের বিবেচনায় তিনি ছিলেন কলকাতার কবি। আমরা ভুল করেছিলাম, যদিও তাঁরই কবিতার নামে বইয়ের নামকরণ করেছিলাম 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'। আরেকটি ভুল ছিল ডিব্রুগড়ের কবি ঊর্ধ্বেন্দু দাশকে অন্ত র্ভুক্ত না-করা, কারণ অনেকদিন আমরা তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। অবশ্য পরবর্তী '৮৭ ইংরেজির সংস্করণে সেই ভুল আমরা শোধরাতে পারি। এই নিয়ে ষাটের সংসার।

৫

ওদিকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতাও পঞ্চাশের শৈশব দ্রুত কাটিয়ে ষাটে এসে অসাধারণ তারুণ্যের পরিচয় দিল— বলা যায় এই দশকেই একসঙ্গে এল তারুণ্য ও যৌবন। এই দশকে এসেই ত্রিপুরার বাংলা কবিতার ধারাও বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় মিশে যায়। আমি বলব, যেমন আসাম অঞ্চলের, তেমনই ত্রিপুরার বাংলা কবিতা চর্চায়ও ষাটের দশক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশক। কবিরা বাংলা কবিতায় তাঁদের সমসাময়িকদেরই সমকক্ষ হয়ে ওঠেন।

এই দশকেই ত্রিপুরার প্রথম কবিতার কাগজ 'জোনাকি' (১৯৬৩) প্রকাশিত হয় কৈলাসহর থেকে, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার সবচেয়ে পরিচিত কবি পীযূষ রাউতের সম্পাদনায়। ত্রিপুরার কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। 'জোনাকি'র তিন বছর পরে ১৯৬৬-তে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় কবি স্বপন সেনগুপ্তের 'নান্দীমুখ'। পীযূষ, স্বপন কেবল ত্রিপুরারই নন, বাংলা সাহিত্যে ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি। বলা প্রয়োজন, এঁরা কেউ একা কাগজ করেননি, 'জোনাকি' ও 'নান্দীমুখ'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন আরও বেশ কয়েকজন তরুণ কবি। তাঁদের কথায় আমি পরে আসব।

১৯৬১ থেকে ১৯৭০ এই দশকে ত্রিপুরা থেকে যে-সব লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 'সংহতি', 'দৃষ্টিকোণ', 'রত্নলিপি', 'জোনাকি', 'প্রদর্শন', 'শুভায়', 'ভাস্কর', 'উত্তরণ', 'গান্ধার', 'অরুণোপল', 'কোলাহল', 'নান্দীমুখ', 'অনির্বাণ', 'ঢেউ', 'কাকলি', 'জঠর', 'প্লাবন', 'ত্রিদিব', 'সৃজনী', 'সমাজ', 'নীহারিকা', 'আর্তনাদ', 'স্বাগতম', 'স্ফুরণ', 'তুলি', 'উদীচী', 'ত্রিভুজ', 'নন্দিনী', 'একাল', 'কাজের শেষে', 'নবারুণ', 'স্বকাল', 'পৌর্ণমী', 'দ্যুতি', 'জ্বালা', 'ব্রততী', 'অংকুর', 'খোয়াই', 'নবাগত', 'অরূপ'— এ-সবের নাম করতে হয় পরপর প্রকাশ কালের ক্রমে। এক দশকে এই চল্লিশটি কাগজের প্রকাশ আগের দশকের তিনটির তুলনায় যেন এক বিস্ফোরণ। আর যদিও অধিকাংশ পত্রিকাই আগরতলা শহর থেকে প্রকাশিত তবু আমরা দেখি কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, বিলনিয়া, অমরপুর কেউই পিছিয়ে নেই। আমরা টের পেলাম ত্রিপুরায় বাংলা কবিতার, বাংলা সাহিত্যের মুখ দ্রুত বদলে গেল। এ-কথা নিশ্চিত যে এই সময় থেকেই ত্রিপুরার ছোটপত্রিকা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে অন্য যে-কোনো রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তার পরেও বলতে হবে এতসব তরুণ-তরুণী যে নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলতে এগিয়ে এলেন, এ তো আর সরকার খুঁজে বের করেনি।

পীযূষ রাউত, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপবিকাশ রায়, বিমল দেব,

নিধু হাজরা, অনিল সরকার, কাজল পুরকায়স্থ, তাপস শীল, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, রাতুল দেববর্মন, অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মন প্রমুখ কবিদের তো আমরা ত্রিপুরার বাইরে বসেই চিনে নিলাম বাংলা সাহিত্যের কবি হিসেবে। পরবর্তীকালে কেউ বেশি কেউ কম খ্যাতি পেয়েছেন নিজেদের শক্তি অনুসারে, কিন্তু যৌথভাবে সমস্ত ত্রিপুরার মুখ তো তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পীযূষ স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫৯ সালে কাছাড় থেকে কৈলাসহর গিয়েছিলেন। কাছাড়ের কবি করুণাসিন্ধুর বন্ধু সিতাংশু পাল ছিলেন পীযূষেরও বন্ধু— ওখানেই তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে সম্পর্কের শুরু। ১৯৬৩-তে কৈলাসহর থেকে পীযূষ যখন ত্রিপুরার প্রথম কবিতার কাগজ 'জোনাকি' প্রকাশ করেন তখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবি মানিক চক্রবর্তী, প্রদীপবিকাশ রায় এবং শিল্পী-কবি বিমল দেবও। কৈলাসহরের একদল শক্তিশালী কবিগোষ্ঠীর কাগজ ছিল 'জোনাকি'। সে-সময় কৈলাসহরকে ভাবা হত ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান। ষাটের দশকে এই ভুবনে বাংলা কবিতায় যে-পরিবর্তনের জোয়ার আসে তাকে নিয়ে এসেছিল প্রধানত অতন্দ্র আর জোনাকি, সঙ্গে শিলচরের আরও কয়েকটি পত্রিকা— যেমন কালীকুসুম চৌধুরীর 'শ্রীভূমি', অতীন দীলারার 'শতাব্দী'। আর এই পরিবর্তনের ধারাকে ধারণ করে পুষ্ট করেছিল, স্থায়ী করেছিল আগরতলার 'নান্দীমুখ' (১৯৬৬ থেকে পঁচিশ বছর) এবং হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' (১৯৬৭ থেকে এখন পর্যন্ত যার নিয়মিত প্রকাশ চলছে)। কৈলাসহরের কবি কাজল পুরকায়স্থ সম্পাদিত 'কাকলি'-র কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। বলা চলে, ত্রিপুরার কবিতাচর্চার জগতে 'জোনাকি' এক নতুন আলো নিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ তো অনেক দূরে, তিরিশ-চল্লিশের কবিদেরও পেরিয়ে 'জোনাকি'-তে পড়েছে পঞ্চাশের, বিশেষ করে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রভাব। এর দু-বছর আগে হাইলাকান্দির 'স্বপ্নিল' অবশ্য তাদের সহযাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল 'কৃত্তিবাস'-কে। কবিতা শুধু আত্মজীবনীমূলক, কবিতা লিখতে হবে মুখের ভাষায়, শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম এ-সব স্লোগানের প্রভাব 'জোনাকি'-তেও আমরা দেখেছি। আর পীযূষের কবিতার ভাষা তো আজও একেবারেই মুখের ভাষা। তবে না, কৃত্তিবাস তাদের গ্রাস করেনি, একটা স্মার্টনেস হয়তো দিয়েছিল— কিন্তু এই ষাটের কবিদের কেউ কেউ নিজস্ব একটা কাব্যভাষা আবিষ্কার করেছিলেন— আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও। ১৯৬৭ সালে 'জোনাকির বক্তব্য কী' প্রসঙ্গে সম্পাদক বলছেন : "প্রাচীন সৃষ্টির প্রতি যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে তার থেকে পৃথক অথচ নতুন কিছু প্রকাশ করা। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের খ্যাত এবং অল্পখ্যাত কবিদের সঙ্গে নতুন কবিদের পরিচয় স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের কাগজকে বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার কবিদের মিলনতীর্থ বলে মনে করি। সম্ভাবনা রয়েছে অথচ সুযোগ নেই এমন তরুণ কবিদের রচনাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করা...।" খুবই সহজ-সরল কথা, কোনো বড় তত্ত্বকথা বলার চেষ্টা ছিল না কোনো কালেই। প্রথমে পঞ্চাশের কবিতার দ্বারা কিছুটা আক্রান্ত হলেও ষাটের কবিরা কিন্তু বেশ সহজভাবেই কোলাহল থেকে সরে এসে অনুভূতির গভীরতার দিকে বাঁক নিলেন।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, একই বছরে প্রকাশিত কাছাড়ের অতন্দ্রের কবিরা ছিলেন আরেকটু পরিণত— কৃত্তিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কিছু বক্তব্য কিংবা তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা কবিতায় এসেছিলেন— শুধু কিছু কবির মিলনতীর্থ গড়া কিংবা কিছু কবিকে পরিচিত করার বাসনা নিয়ে তাঁরা এলেন না, তাই তাঁদের কাব্যচর্চাকে আন্দোলন নামে অভিহিত করা হল— প্রথমে কাছাড় কাব্য-আন্দোলন, পরে অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলন নামে।

যা হোক, আবার ত্রিপুরার কথায় আসি। সপ্তম দশকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতার জগতে 'জোনাকি' থেকে আরম্ভ করে 'কাকলি', 'স্বাগতম', 'প্রদর্শন', 'গান্ধার', 'নান্দীমুখ', 'ঢেউ', 'জঠর', 'আর্তনাদ' ইত্যাদি পত্রিকা আশ্রয় করে যে-নবযুগের সূচনা হল তার নির্বাচিত রূপ আমরা দেখলাম ১৯৭৩ সালে স্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের কবিতা সংকলন 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-তে। এই সংকলনের নির্বাচিত বারোজন কবি হলেন রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, মিহির দেব, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, মানিক ধর, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, পীযূষ রাউত, মানস দেববর্মন, প্রদীপবিকাশ রায় ও স্বপন সেনগুপ্ত। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে আমরা আগের দশকেই পেয়েছিলাম— বাকি নয়জন একেবারেই এই দশকের। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল তরুণ কবি বলে পরিচিত হলেন।

এর পরে ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা আর পিছন ফিরে তাকাল না। আমরা একের পর এক পেয়ে গেলাম সমরজিৎ সিংহ, কাজল পুরকায়স্থ (শান্তনু ঘোষ যে-বছর কৃত্তিবাস পুরস্কার পেলেন সে-বছরই কাজলের নামও এ-অঞ্চলের প্রাথমিক নির্বাচন তালিকায় ছিল), হিমাদ্রি দেব, নকুল রায়, রাতুল দেববর্মনের মতো শক্তিশালী কবিদের। দশকে দশকে এই তালিকা দীর্ঘ হল যাঁদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসীম দত্তরায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, পল্লব ভট্টাচার্য, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়, দিলীপ দাশ, শুভেশ চৌধুরী, নকুল দাস, সেলিম মুস্তাফা, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, অশোক দেব, অপরাজিতা রায়, দেবাশিস তরফদার (ডাক্তার), তাপস রায়, প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, কিশোররঞ্জন দে, কল্যাণ গুপ্ত, সনজিৎ বণিক, লক্ষ্মণ বণিক, দীপঙ্কর সাহা, সুবিনয় দাস, মৃন্ময় সেন, সুনীল ভৌমিক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, মলয় চক্রবর্তী, মাধব বণিক, দেবাশিস চৌধুরী, স্বাতী ইন্দু, প্রত্যুষ দেব, কৃষ্ণধন আচার্য, গোবিন্দ ধর, শিশিরকুমার সিংহ, শংকর বসু, সিরাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। এই তালিকা বয়সের ক্রম মেনে নয়, আমার জানার ক্রম অনুযায়ী।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকে (আগস্ট ১৯৯০) এসে ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্ব-নির্বাচিত কবিতা সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে শিশিরকুমার সিংহ লিখলেন, "দুঃখের বিষয় এই যে, কিছুকাল আগেও এখানকার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তেমন মনোযোগ বা কৌতূহল মূলধারার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।" শিশিরবাবুর মূল ধারার কবি-সাহিত্যিক কারা আমরা জানি না, তবে আমি মনে করি গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে বাংলা কবিতার জগতে যখন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষণ স্পষ্ট হল, তখন থেকে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা ধারণ করল সারা ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন। আজও তা-ই রয়েছে— লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ধারাই বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত আর এই স্রোতের অংশীদার ত্রিপুরার কবিতাও সেই সপ্তম দশকেই। ত্রিপুরার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম স্বপন সেনগুপ্ত তাই বলেন— "বাংলা কবিতার মূল স্রোতে সহাবস্থান করলেও ত্রিপুরায় একমাত্র বিক্ষিপ্তভাব কবিতায় ও গদ্যে হাংরি জেনারেশনের অভিঘাত ছাড়া আর কোন আন্দোলন দাগ কাটেনি কখনো।...

"...আধুনিক জীবনের সমবয়সী বিষাদ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও দ্বন্দ্ব যন্ত্রণায় নিয়ত বিকিরণ ঘটছে ত্রিপুরার কবিতায়। দাঁতাল হিংস্র সময়ের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে সটান দাঁড়ানোরই অন্য নাম শ্রেণী সংগ্রাম। পূর্বোত্তরের কবিতাকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক ভাবতে পারেন না বাংলা কবিতার সামগ্রিক বিকাশ ও চিত্রকল্পের কথা।"[৬]

এখানে একটা কথা খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বাংলা কবিতার মূল স্রোতে সহাবস্থান মানে এই নয় যে কলকাতা কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলের আন্দোলনের অভিঘাত পড়তে হবে এখানে কিংবা এও নয় যে এ-অঞ্চলের আন্দোলনের অভিঘাত পড়তে হবে কলকাতা অঞ্চলের কবিতায়। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে কলকাতায় কিংবা তার আশেপাশে কবিতার দিনবদলের যে-সব আন্দোলন হয়েছে তাদের অনেকগুলোর নাম কলকাতার প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা জেনে গেছেন। হাংরি জেনারেশন, নিম সাহিত্য, শ্রুতি, শাস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন— কত নাম, যদিও আজ তারা সব মিলেমিশে একাকার, তবু কলকাতাকেন্দ্রিক বহু আলোচনায় এ-সব নাম আজও শোনা যায়। অথচ একই সময়কালে বর্তমান বরাক উপত্যকায় স্বপ্নিল-অতন্দ্র-সাহিত্য-শতাব্দী ইত্যাদি পত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা কবিতার জগতে যে-পরিবর্তন আসে— যাকে অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলন কিংবা কাছাড় কাব্য-আন্দোলন নামে অনেকে চিহ্নিত করেছেন— যার প্রথম ফসল 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' প্রকাশিত হতেই কলকাতার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক পত্রিকাও এই কবিদের সে-সময়ের বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছিল, সেই আন্দোলনের কথা আজকের বাংলা সাহিত্যের রাজধানীর আলোচকেরা চেপে যান। তাঁরা জোনাকি-নান্দীমুখ-কাকলি-স্বকাল-পৌণমী-ত্রিভুজ ইত্যাদি পত্রিকা নিয়ে ত্রিপুরায় বাংলা কবিতার যে-দিনবদল ঘটে তার কথাও দিব্যি ভুলে যান। অষ্টম, নবম কি দশম দশকে যা-ই হোক, সপ্তম দশকেই কিন্তু ত্রিপুরার পীযূষ, স্বপন, প্রদীপবিকাশ, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব কিংবা কল্যাণব্রতরা তাঁদের পত্রপত্রিকায় এবং 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-র মতো একটি উঁচুমানের সংকলনের জন্য বাংলা কবিতার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে থেকে

আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শক্তিশালী কবি স্বপন সেনগুপ্তের নান্দীমুখে কোনো-না-কোনো সময়ে লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের কোন্ ভালো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখেননি পীযূষ রাউত, আর হাংরির দৌলতে প্রদীপ চৌধুরী তো ছিলেন বহু-আলোচিত।

এঁদের পর যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার বাইরে হয়তো সবচেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছেন সমরজিৎ সিংহ কিংবা প্রবুদ্ধসুন্দর, কিন্তু এই সময়ের আরও যে-কবিদের নাম আমি আগেই করেছি তাঁরা তো রচনার গুণগতমানে এ-দুজনের কেবল সমকক্ষই নন, অনেকে তো মনে হয় আরও বেশি স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন, আর বস্তুত ত্রিপুরায় কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাও পেয়েছেন।

সেলিম মুস্তাফা নামে একজন কবিকে দেখি ত্রিপুরার কবিতার সংকলকরা নিয়মিত অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করা ঠিক নয় বলেই আমি মনে করি। হ্যাঁ, একমাত্র ত্রিপুরাতেই, যেখানে হাংরি জেনারেশনের একটা স্রোত নেমে এসেছিল কলকাতা থেকে, গদ্যেপদ্যে আমরা তেমন কিছু লোককে পাই যাঁরা নিজেদের হাংরি বলে পরিচিত করেছিলেন এবং এখনও করছেন; জানি তাঁরা ত্রিপুরার বাংলা কবিতার মূল ধারায় নেই, তবু তাঁরা কোন্ তত্ত্বের কথা বলেন সে-কথা না-ভেবে যদি আমরা তাঁদের কবিতা দিয়ে বিচার করি, তাহলে তাঁদের সকলকে অস্বীকার করতে পারি না।

কলকাতার অনুকরণ করে মূল স্রোতের অংশীদার হওয়া নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, আসাম-ত্রিপুরার কবিরা চিন্তাচেতনা, যুগের ভাবনার দিক থেকে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অঞ্চলের কাব্য-ভাবনার সমসাময়িক, আর সেইসঙ্গে বাংলা কবিতায় যোগ করেছিলেন এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও। দিকে দিকে বাংলা কবিতার চর্চা গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল নানাভাবে। ত্রিপুরা সেখানে ছিল অন্যদের যোগ্য সহযাত্রী।

৬

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কেবল শিলং এবং কাছাড়ই নয়, গুয়াহাটি শহরেও বাংলা কাব্যের আধুনিকতার ঢেউ লাগে প্রধানত বিশ্বজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'সময়' পত্রিকার হাত ধরে। বিশ্বজিৎ চৌধুরী গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, উদয়ন, আমি আর শান্তনু গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ অতন্দ্রের একটা অংশ গুয়াহাটিতেও সক্রিয়। জিতেন নাগও যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে।

সুতরাং গুয়াহাটি আর জালুকবাড়ির বিভিন্ন স্টলে তখন অতন্দ্রের আড্ডা জমে উঠত। অধ্যাপক-কবি হীরেন দত্ত কিংবা অধ্যাপক-ছোটগল্পকার ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার একাধিক আড্ডায় সে-কালের অসমিয়া সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ঘটে বাংলা কবিতার। সেই যোগ নানা সময়ে মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে আসামের বাংলা কবিতায়। বিশেষ করে উদয়ন, শান্তনু ও আমার কবিতায় সে-কালের ও স্থানের অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই ধরা পড়েছে। বলা চলে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে অতন্দ্র তখন যতটা শিলচরে ততটাই গুয়াহাটিতেও। অবশ্য গুয়াহাটিতে তখন স্থানীয় বাঙালিদের উদ্যোগে কোনো বাংলা কবিতার কাগজ জন্ম নেয়নি। যদিও শিব ভট্টাচার্য, অখিল দত্ত, সুভাষ কর্মকাররা জন্ম দিয়েছিলেন 'একাল' বলে উল্লেখযোগ্য গল্প-পত্রিকার।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত থেকে শুরু করে আসামের এই ষাটের দশকের অনেকের কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমি আমার 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের দুই খণ্ডে তাঁদের অনেককে নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আপাতত দেখি গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে আমরা কী পেলাম, কাদের পেলাম।

'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র প্রথম প্রকাশের পরবর্তী তিন দশক ধরে আসামে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে যেমন 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কবিদের ক্রমবিকাশ লক্ষ করি, ঠিক সে-ভাবেই লক্ষ করি একের পর এক কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং তাঁদের নতুন নতুন পত্রিকার প্রকাশ। আগে লিখেছিলাম যে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' গ্রন্থখানাকে মাঝখানে রেখে কাছাড় কাব্য-আন্দোলনের দুটি পর্ব। এবারে বলব— কেবল কাছাড় কাব্য- আন্দোলন নয়, বৃহত্তর আসামের কাব্যচর্চারও দুটি পর্ব এই গ্রন্থটি ভাগ করেছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৎকালীন (২০০৫) প্রধান ড. সুবীর কর লিখলেন, "এই 'আলো হাওয়া রৌদ্রে'র আত্মপ্রকাশ কাছাড়ের কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল।" লিখলেন, কারণ কাব্য-সংকলনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকল। যা দিল এই নতুন দিগন্তের সন্ধান।

পরবর্তী পর্যায়ের কাব্য-আলোচনায় এই দ্রুত ঘটে-যাওয়া

ঘটনাগুলোর প্রভাব অনেকখানি।

'দেশ' পত্রিকা যখন বলল কাছাড়ের এই কবিরা বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবার অধিকার রাখেন তখন এ-অঞ্চলের পাঠকের কাছে এবং বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যেও আসামে রচিত বাংলা কবিতার মান এক লাফে অনেকটা উঠে গেল। মাত্র ছ-মাসের মধ্যে কাছাড়, শিলঙের বইয়ের দোকানের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে গেল। (পঁচিশ বছর পর যখন বিশ্বজ্ঞান সংস্করণ বেরোল তার বিক্রিও হয়ে গেল খুব দ্রুত।)

এতে বাংলা কবিতার জগতে যে-গুডউইলটা তৈরি হল সেটা নতুন-পুরনো সবাইকে প্রভাবিত করল— কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের এক নবযুগ এল এ-অঞ্চলে। নতুন নতুন পত্রিকা, নতুন কবিগোষ্ঠী এলেন কেবল কাছাড়ে নয়, সমস্ত আসামে। পশ্চিমবঙ্গের বহু কাগজ কেবল কাছাড়ের কবিদের কবিতা নিয়েই ছাপতে আরম্ভ করলেন না, এ-অঞ্চলের কবিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার জন্যও আমন্ত্রণ আসতে লাগল নিয়মিত। ১৯৬৭ সালে তারাপদ রায়ের অনুরোধে তৎকালীন 'আসামের আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখি তাঁর 'কয়েকজন' কাগজে। এই প্রবন্ধটা সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটি এবং তার কয়েক বছর আগে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় রামেন্দ্র দেশমুখ্য ও সুধীর সেনের প্রবন্ধ 'কবির শহর শিলচর' বাঙালি পাঠককে এ-অঞ্চলের কবিতা সম্পর্কে আগ্রহী করেছিল — এবং এই আগ্রহটা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিল 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'।

আরেকটা ঘটনার কথা বলি। এই সময় আসামের কবিদের কিংবা কলকাতার বাইরের তরুণ কবিদের যতই পরিচিতি ঘটুক-না কেন, বাংলা কবিতার সংকলনগুলো তখনও একান্ত ভাবেই কলকাতা-কেন্দ্রিক। সাহিত্য-১০-এ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সংকলন' নামে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখলাম। তাতে প্রকাশিত সংকলনগুলির ত্রুটি দেখিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের কাছে অনুরোধ রাখলাম 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র মতো তাঁরাও যেন নিজ নিজ অঞ্চলের প্রধান কবিদের নিয়ে সংকলন প্রকাশ করেন। তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংকলনের পাশাপাশি এইসব আঞ্চলিক সংকলন মিলিয়ে পাঠক বাংলা কবিতার একটি সম্পূর্ণ মুখ দেখার সুযোগ পাবেন।

দু-এক বছরের মধ্যে জামশেদপুর থেকে কমল চক্রবর্তী 'কৌরব' নামে একটি সংকলন করলেন, স্বপন সেনগুপ্ত করলেন ত্রিপুরার কবিতা নিয়ে 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', মেদিনীপুরের কবিতা নিয়ে গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন সংকলন 'চান্দ্রমাস'। চান্দ্রমাস-এ গৌরশংকর তো সাহিত্যে প্রকাশিত অনুরোধটাও ছাপিয়ে দিলেন গ্রন্থের চতুর্থ কভারে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার একটা প্রভাব পড়ল দূরে দূরে— মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে শ্যামলকান্তি দাশ, মহিষাদল থেকে গৌরশংকর, কলকাতা থেকে অরণি বসু, উত্তরবঙ্গ থেকে পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত এবং আরও অনেক তরুণ কবির কবিতা আসতে শুরু করেছে সাহিত্যে।

অতন্দ্রে যার জন্ম এবং উত্তেজনাময় শৈশব, সেই কাব্য-আন্দোলনের উত্তজনাহীন এবং ধীর পদক্ষেপে বিকাশ ঘটেছিল 'সাহিত্য'-তে সে-কথা সকলেই লক্ষ করলেন। আর নতুন নতুন পত্রিকা তো এলই, 'সাহিত্য'-পরিবারে জন্ম নিতে লাগলেন নতুন নতুন কবিরা, পুনর্জন্ম ঘটল পুরনো অনেক কবির।

১৯৭০ সালেই 'সাহিত্য'-তে দেখা দিলেন নতুন দুই কবি, দিলীপকান্তি লস্কর আর অমিতাভ চৌধুরী (অমিত চৌধুরী); পরের বছর দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, '৭৩-এ সমরজিৎ সিংহ, '৭৪-এ ভক্ত সিং আর আশুতোষ দাশ। ১৯৭৪ সালেই এলেন শিলঙের কবি রমানাথ ভট্টাচার্য, কবি দেবাশিস তরফদার। দেবাশিস এলেন খুব সাড়া জাগিয়ে। প্রথম প্রকাশেই সাহিত্যে তাঁর গুচ্ছকবিতা ছাপা হল। অতন্দ্র-সাহিত্যের কবিদের সঙ্গে তরুণদের মিলনে এক নতুন সাহিত্য-পরিবার গড়ে উঠল যা কালে কালে বড় হয়ে আজও বর্তমান।

তবে এও ঠিক সাহিত্যে যাঁরা এলেন, সকলেই সাহিত্য-পরিবারে যুক্ত হলেন না, হয় নিজেরা পত্রিকা করলেন অথবা মুক্ত রইলেন সকল গোষ্ঠী থেকেই।

১৯৭০-এর শেষার্ধে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হল একটি ছোট্ট পত্রিকা 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে'। পরে নাম হল 'রেণসাঁ'— সম্পাদনায় 'ত্রয়ী' মানে বাহারউদ্দিন, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য (যিনি প্রকাশক হিসেবে প্রথম যুক্ত ছিলেন সাহিত্যে) আর তড়িৎ চৌধুরী। হ্যাঁ, আজকের গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক উষারঞ্জন তখন কবিতা লিখেছেন। 'রেণসাঁ'-র ত্রয়ী বাংলা সাহিত্যের সে-সময়ের

প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে ছিলেন খুবই পরিচিত, তবে আসামে এই গোষ্ঠীই একমাত্র যাঁরা হাংরি কিংবা নিম সাহিত্য, না-সাহিত্য, অল্প-সাহিত্য প্রভৃতি উত্তেজক ধারাগুলির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত যুক্ত। হয়তো এ-বিষয়টা তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। তিন বছর বাদে সপ্তম সংকলনে বলছেন, ''রেণসাঁ কথা বলবে নিজের মতো করে, বিলম্বিত কোন দীর্ঘছায়ার স্পর্শ থেকেও তাকে আমরা মুক্ত রাখব।'' এই-যে সম্পূর্ণ নিজেদের মতো কথা বলা, নিজেদের আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে কথা বলা— এটা আসামের বাংলা কবিতার বিশেষ লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ-জাত বিভিন্ন আন্দোলন ত্রিপুরায় যতটা প্রশ্রয় পেয়েছে আসাম অঞ্চলে তা পায়নি। এমন-কি তপোধীরের মতো উত্তরাধুনিকের অন্যতম প্রবক্তাও বরাকের তরুণ শক্তিশালী কবিদের প্রভাবিত করতে পারেননি। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আসামের বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। তবে এ-কথাও নিশ্চিত সত্য যে পৃথিবীর বুকে যেখানেই কোনো সার্থক কিংবা অসার্থক আন্দোলনই গড়ে উঠুক— সব কিছুরই একটা দাগ থেকে যায় অন্যদের উপর। বাংলা কাব্যের যত আন্দোলন কিংবা আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যত রাজনৈতিক, সামাজিক, ভাষাপ্রেমের কিংবা উগ্রতার আন্দোলন কোনো কিছুই আমাদের জীবনকে ছেড়ে দেয় না— বরং এক নতুন রূপে গড়ে তোলে।

মেঘালয় সৃষ্টির পর আসামের রাজধানী যখন গুয়াহাটিতে চলে গেল তার পরে বিশেষভাবে গুয়াহাটি শহর বাংলাচর্চার একটি কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। একসময় কাছাড় জেলা, তারপর শিলং, ডিব্রুগড়, যোরহাট, এমন-কি ডিগবয়ের নামও আসত কিন্তু পুরনো গুয়াহাটির ভূমিকা ছিল গৌণ। বর্তমানে গুয়াহাটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর, বিভিন্ন দিকে তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়ও মহানগর গুয়াহাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গুয়াহাটির 'প্রাচী ধরিত্রী' শরৎ ১৩৯৭ (১৯৯০) সংখ্যায় গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা থেকে দেখি, হাইলাকান্দি থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশের (১৯৬৭) আগে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র দশ, পরবর্তী পঁচিশ বছরে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ। বলা চলে পত্রিকা প্রকাশের বিস্ফোরণ, যা আমরা কাছাড়ে দেখেছি পঞ্চাশের দশকে, ত্রিপুরায় ষাটের দশকে।

'সময়', 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে', 'রেণসাঁ'-র কথা বলেছি, আরও যে-সব পত্রিকা প্রকাশনার উন্নতমানের জন্য পাঠকের কাছে যথেষ্ট মূল্য পেয়েছে, তাদের মধ্যে আছে 'একা এবং কয়েকজন', 'কিন্নরকণ্ঠ', 'পূর্বমেঘ', 'পূর্বা', 'প্রাচী ধরিত্রী', 'শব্দ', 'শিলালিপি', 'স্বরের আড়ালে শ্রুতি', 'মহাবাহু', 'পত্রপুট', 'মাজুলি' ইত্যাদি।

'পাঁক ঘেঁটে পাতালে'-'রেণসাঁ'র পরে পরে যোরহাটে এল 'মজলিশ', কাছাড়ে 'শতক্রতু'। মজলিশ-এ যেমন ষাটের দশকে হারিয়ে-যাওয়া কবি ঊর্ধ্বেন্দু দাশকে পুনর্বার পেলাম, পেলাম নতুন কবি দীপঙ্কর নাথ, নারায়ণ দাশ, কমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং জীবনজ্যোতি দেবকে। ওদিকে গদ্যপ্রধান 'শতক্রতু' উপহার দিল কবি তপোধীর ভট্টাচার্য এবং কবি অরুণ চন্দকে (অকালপ্রয়াত)। একসময় ত্রিপুরার কবি সমরজিৎ সিংহ, যোরহাটের দীপঙ্কর মিশে গেলেন 'শতক্রতু'-র দলে। এই সময়ের কবি করুণাকান্তি দাশ, মহুয়া চৌধুরীরাও।

শিলং থেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর সত্তরের গোড়ায়। তাঁদের পত্রিকা 'ঋতুরঙ্গ', 'শিলঙের কবিতা', 'পাহাড়িয়া' একের পর এক প্রকাশিত হল। এদিকে শিলঙে তখন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত সবার মাথার উপরে, আছেন উদয়ন ঘোষও। বীরেন্দ্রনাথদের পত্রিকা 'পূর্ব ভারতী' অনেক আশা জাগিয়েছিল সত্তরের দশকের শুরুতে। শিলঙে চাকরিসূত্রে এলেন মৃণাল বসু চৌধুরী, 'দেশ' পত্রিকার উপর অভিমান করে 'দেশান্তর' নামে কবিতার পত্রিকা করলেন। তিনি সাহিত্যের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন কিছুকাল। মৃণাল বদলি হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর এলেন শংকর চক্রবর্তী, তিনি প্রকাশ করলেন 'শতাব্দী' নামে কবিতার কাগজ। আসামের দ্বিতীয় 'শতাব্দী', প্রথম 'শতাব্দী' শিলচরের অতীন দাশ, দীলারা, গণেশ দে-র কাগজ। হাইলাকান্দিতেও আশুতোষ দাসের নতুন কাগজ 'বেলাভূমি' প্রকাশিত হল সম্ভবত ১৯৭৬-এ। এই পত্রিকার নিয়মিত কবিদের মধ্যে ছিলেন ভক্ত সিং, মাসুক আহমেদ, রামরঞ্জন চক্রবর্তী। আরও পরে আশির দশকে এলেন তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, কৃষ্ণ মিশ্র, কল্লোল চৌধুরীরা।

করিমগঞ্জ থেকে ষাটের অন্তিম লগ্নে প্রকাশিত হল পঞ্চমিত্র সম্পাদিত 'উদর্ক' পত্রিকা। পঞ্চাশের দশকের অতুলরঞ্জন দেব

এই পত্রিকার প্রধান কবি। সত্তরের দশকেই করিমগঞ্জে পেলাম আরেক কবিকে, তিনি জন্মজিৎ রায়। যা হোক আমরা দেখছি, কাছাড় সহ আসামের বিভিন্ন স্থানে এলেন অনেক নতুন কবি— শুরু হল ষাটের কবিদের পাশাপাশি একদল নতুন এবং সত্যিকারের শক্তিশালী কবিদের যাত্রা।

তাহলে সত্তরের দশকে নবাগত উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকা হবে এ-রকম— দিলীপকান্তি লস্কর, অমিত চৌধুরী, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, বাহারউদ্দিন, দীপঙ্কর নাথ, তপোধীর ভট্টাচার্য, ভক্ত সিং, আশুতোষ দাস, দেবাশিস তরফদার, সমরজিৎ সিংহ, রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর, জন্মজিৎ রায়, করুণাকান্তি, মহুয়া চৌধুরী প্রমুখ। এ ছাড়া পঞ্চাশের দশকে কিংবা ষাটের গোড়ায় ভালো কবিতা লিখেও যাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন তেমন কয়েকজনকে পেলাম সত্তরের দশকে।

সত্তরের দশক গেল। আশির দশকে একেবারে গোড়ায় শিলচর থেকে পেলাম পরপর আরও দুটি পত্রিকা— 'ইত্যাদি' ও 'প্রতিস্রোত'। পত্রিকা দুটি নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ছোট পত্রিকার কথা' প্রবন্ধে।[৭] এই পত্রিকাগোষ্ঠীর হাত ধরে যে-কবিরা এলেন তাঁরা হলেন বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শঙ্করজ্যোতি দেব, জয়দেব ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম মৈত্র, মঞ্জুগোপাল দেব, সৌমিত্র বৈশ্য, বনানী ভট্টাচার্য, স্বর্ণালী বিশ্বাস (বর্তমানে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পদবি ভট্টাচার্য), ভাস্করজ্যোতি দেব, সুজিৎ দাস, শেলী দাস চৌধুরী, স্মৃতি পাল নাথ প্রমুখ।

'প্রতিস্রোত' প্রকাশ করেছিলেন 'ইত্যাদি' থেকে সরে-আসা পার্থপ্রতিম মৈত্র, সুজিৎ দাস, ভাস্করজ্যোতি দেব, পরম ভট্টাচার্য এবং প্রদীপ পাল প্রমুখ বারোজন কবি ও গল্পকার। আশির দশক থেকেই আরও কয়েকটি পত্রিকা করিমগঞ্জের 'শরিক', 'লালনমঞ্চ', শিলচরের 'মা নিষাদ', 'অনীশ্বর', শিলচর ও হাফলং থেকে প্রকাশিত 'জাতিঙ্গা', হাইলাকান্দি থেকে 'প্রবাহ', 'চম্পাকলি' এমনই আরও বেশকিছু নতুন পত্রিকা পেলাম। যে-সব নতুন কবিদের পেলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বজিৎ চৌধুরী (অতন্দ্রের বিশ্বজিৎ নন), সুব্রতকুমার রায়, দেবাশিস চন্দ, তুষারকান্তি নাথ, আশিস নাথ, জালাল উদ্দিন লস্কর, জসীম উদ্দিন লস্কর, দীপালি দত্ত চৌধুরী, জগদীশ চক্রবর্তী, আবুল হোসেন মজুমদার প্রমুখ। বদরপুরের কবি কিরণশংকর রায় প্রায় ষাটের কবিদেরই সমসাময়িক, আর পাঁচগ্রামের কাব্যশ্রী ভট্টাচার্য বক্সীও বোধহয় গত শতাব্দীর শেষ দশকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত হলেন।

গুয়াহাটির অজিত দত্তই প্রথম সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের কবিতার একটি সুসম্পাদিত সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৮৩ সালে। আমার মনে হয় এটাই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার শ্রেষ্ঠ সংকলন। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে আমরা জেনেছিলাম "পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ গৌহাটী থেকে সূর্য্য নামে একটি উচ্চমানের সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী। পত্রিকাটি কবিতা বিষয়ক না হলেও ঐ সময়কার বাংলা কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অবশ্যই। কালাচাঁদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অমলেন্দু গুহ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ভরত ঘোষ, নিখিল চক্রবর্তীর মতো শক্তিশালী কবিরা নিয়মিত কবিতা লিখতেন এই পত্রিকায়। ষাট ও সত্তরের দশকের মধ্যে গৌহাটী থেকে প্রকাশ পেয়েছিল সুনীতি সেন সম্পাদিত সপ্তপর্ণ; বিদ্যুৎবরণ কুণ্ডু, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও মনীশ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল সাথী, বিপ্লব ঘোষ ও উদয়ন বিশ্বাস সম্পাদিত ইদানীং ও বেতাল গোষ্ঠী সম্পাদিত অধুনা।"

কমল সাহা, বিশ্বজিৎ নন্দী এবং হেলালুজ্জামান সম্পাদিত 'গারো পাহাড়ের কবিতা' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে গারো পাহাড়ে বাংলা কবিতা চর্চা বেশ উন্নত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এক-একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'মেঘালয়' সৃষ্টির পর গুহায়াটিতে বাংলা সাহিত্য চর্চার উন্নতি আমরা আগেই লক্ষ করেছি, একই ভাবে গারো পাহাড়ে যে বাংলা কবিতার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না। 'গারো পাহাড়ের কবিতা' সংকলনে সংকলিত কবি চোদ্দজন, কবিরা হলেন— কমল সাহা, হেলালুজ্জামান, জগদীশ বর্মন, বিশ্বজিৎ নাগ, প্রাণেশ কর, নবগোপাল দেব, কানুপ্রসন্ন চৌধুরী, মলয় নাগ, মজীদুর রহমান লস্কর এবং বিশ্বজিৎ নন্দী প্রমুখ। বিশ্বজিৎ নন্দী সহ আরও কেউ কেউ এখন বাংলা কাব্যে বেশ পরিচিত নাম।

যদিও একসময়ে এ-অঞ্চলের কবিরা প্রধানত লিট্‌ল ম্যাগাজিন আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের কথা জানতে হলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনই ছিল একমাত্র ভরসা, কিন্তু

আমরা দেখলাম সত্তরের দশকের শুরু থেকে প্রধান অপ্রধান কবিদের নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশেরও জোয়ার এল। প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল সম্পাদিত কাব্য-সংকলনও। কিছু কাব্য-সংকলনের নাম আমরা করতে পারি যা আগ্রহী পাঠককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার একটা পরিচয় দিতে পারবে। ১৯৬৯-এ 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কথা বলেছি; এরপর ১৯৭৩-এ স্বপন সেনগুপ্তের 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'— বই দুটি যথাক্রমে আসাম ও ত্রিপুরার বারোজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কবিতার সংকলন। ১৯৮৩ সালে পেলাম 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলন, যার সম্পাদক কুমার অজিত দত্ত। আসাম ত্রিপুরা মিলিয়ে মোট চুয়ান্নজন কবি। ১৯৮৭-তে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র পরিবর্ধিত (বিশ্বজ্ঞান) সংকলন। নতুন যে-কবিরা যুক্ত হলেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ছবি গুপ্তা, উর্ধ্বেন্দু দাশ, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর নাথ, আশুতোষ দাস, ভক্ত সিং, দেবাশিস তরফদার, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম মৈত্র, শঙ্করজ্যোতি দেব ও জয়দেব ভট্টাচার্য। ১৯৯০ সালে শিশিরকুমার সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' (৪১ জন কবি)। ১৯৯১ সালে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও বিশ্বতোষ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল কেবল বরাক উপত্যকার চুরাশি জন কবির কবিতা-সংকলন 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ'। তারপর গত শতাব্দী যখন শেষ হবার পথে (১৯৯৯) তখন স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হল, কবির সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ। গত শতাব্দীতে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা থেকে বাছাই করে 'নির্বাচিত সাহিত্য-১, বাংলা কবিতা' গ্রন্থটি যখন আমরা প্রকাশ করি সেই সংকলনের কবির মধ্যে ৫১ জনই ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। বাকি চুয়ান্নজন পশ্চিমবঙ্গ বা তারও পশ্চিমের। আর ২০০৩-এ প্রকাশিত 'গারো পাহাড়ের বাংলা কবিতা' গ্রন্থটির উল্লেখ আগেই করেছি।

এর বাইরেও আরও কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এইসব সংকলন বাদ দিয়েও কবিদের নিজস্ব গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। হ্যাঁ, এত কবি, এত কবিতা গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে আমরা পেয়েছি আসামে। এত কবিতা যখন আলোচ্য তখন একটি স্মারক বক্তৃতায় সকলের কথা বলা যে প্রায় অসাধ্য সে নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না। আর আমার বক্তব্য আমার বিচারের মধ্যেই থাকবে এও স্বাভাবিক। আমি সেই বিচারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

বাংলা সাহিত্যে, আমার আলোচ্য সময়ে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতার মূল চরিত্র এবং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এতক্ষণের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আরও কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা এবার বলি।

স্বাধীনতা ও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আসাম রাজ্যে বাঙালিরা যে-অমানবিক ব্যবহার পেয়েছেন, ভারতে আর-কোনো জাতিকে তা সহ্য করতে হয়নি এবং এখনও তা সমানভাবে চলছে। এ-সব নিয়ে আমি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বাঙালি যখন মাতৃভাষা রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছে তখন আমাদের মতো কবিদের মনে হয়েছিল, এ-অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যচর্চা যদি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদা পায় তবে আসামের বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। সেই ভাষার প্রতি ভালোবাসা-বোধ থেকে নতুন নতুন ভাবনায় কাব্য-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা জুগিয়েছিল— ষাটের কবিরা তাই নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের কলকাতা-কেন্দ্রিক কবিপাঠকসমালোচকদের। কিন্তু আরও কিছুদিন পরে দেখা গেল, কেবল এখানেই শেষ নয়, প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের ভাষাও জন্ম নিয়েছে এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতায়। উনিশের কবিতা ও গানের সংকলন করেছেন দিলীপকান্তি লস্কর ২০০৩ সালে, অতীন দাশও সম্পাদনা করেছেন '১৯শের কবিতা' নামে একটি সংকলন এই কিছুদিন আগে। এ-সব কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, একেবারে নতুন। কোনো অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যে এমনটা পাওয়া যাবে না।

আজকাল সরকারি দপ্তরে 'ভ্রষ্টাচার' নিয়ে দেশে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতার এক-দেড় দশক পরেই এই দুর্নীতির ব্যাপকতা আরম্ভ হয়, এবং আসাম তাতে বোধহয় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। টাকার বদলে স্কুলের চাকরি কেনা সেই ৫৯-৬০ সালেই আসামে আরম্ভ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তো এই চাকরি-বাণিজ্যের কথা এখনও (২০১১) তেমন জানেন না। আসামে রচিত বাংলা গদ্যে তার বর্ণনা আছে, অতন্দ্রের কবিরা এ-সব দেখেই কিছু কিছু কবিতায় তাঁদের ঘৃণা, ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

তারপর আসি ভাষার আঞ্চলিক রূপের কথায়। আমরা আজ যাকে উপভাষা বলতে শিখেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকে উপভাষা বলেননি। কারণ উপভাষা শব্দের মধ্যে একটি কথা লুকিয়ে আছে— তা হল একটি মূল ভাষা আছে। আসলে একই ভাষার নানারকম রূপ থাকে ভাষা ব্যবহারের অঞ্চল ও লোকসংখ্যা বৃহৎ হলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলাভাষার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতের কথা— যার একটি বিশেষ প্রাকৃত চলছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা হল একটা বিশেষ প্রাকৃতকে মান্যভাষা বলে মেনে নিলেও, শক্তিশালী লেখকেরা সেই ভাষার পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতকে ব্যবহার করে মান্য ভাষাকে এবং সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের সুরমাবরাক অঞ্চলের কিংবা ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রাকৃতকে খুবই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক শক্তিমান কবি তাঁদের কবিতায়, যা সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কবিতাকে— দিয়েছে এক ভিন্ন স্বাদ। এই অঞ্চলের লোকসংগীত ও লোকসাহিত্যও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে কবিদের।

৭

আমাদের এই ভুবনের সাহিত্য নিয়ে কবিতা নিয়ে আমি গত চার দশকে অনেক গদ্য লিখেছি, আগেই বলেছি 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দুটি খণ্ডে, আরেকটি খণ্ডের কাজ প্রস্তুতির পথে— সেখানে যেমন আমি এ-অঞ্চলের পত্রপত্রিকা ও কবিতা নিয়ে বিস্তারিত বলেছি তেমনই বলেছি কয়েকজন প্রধান কবিকে নিয়েও। এই ছোট্ট বক্তব্যে সেইসব আলোচনা থেকে কিছু কিছু তুলে দিয়েছি মাত্র, সুতরাং অনেক কিছুই বিস্তারিত করা গেল না— যাবেও না। এ-আলোচনা আমার আগেকার আলোচনার সারসংক্ষেপ মাত্র। তবু যাঁদের নিয়ে আলোচনা তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবীণ কয়েকজনের কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি আশ্রয় করে এ-অঞ্চলের কবিতার সামান্য পরিচয় দিতে চাই। এই বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে।

প্রথমে বলি ত্রিপুরার কথা। কালানুক্রমিক ভাবে আমার আলোচ্য প্রধান কবিদের মুখ একটু একটু দেখি :

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'জলের ভেতর বুকের ভেতর'।

"আঁধার আর মানে না ভয়, জলের ভেতর
তোমার সূর্য আলো পাখি সবই যেন
আজ হেঁয়ালি, কি বিশ্বাসে বুকের ভেতর
হাঁটবো আমি, সেখানেও একই স্বর—
ভয়ঙ্কর এক শব্দ করে ডুবলে কেউ টের পায় না
আজ হেঁয়ালি মরণ ছাড়া নেই তো কিছু
বুকের ভেতর ভালোবাসার নামান্তর।"

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী আরেক প্রবীণ কবি— তাঁরও কবিতায় এক বিষাদের ছায়া। 'ফেরা' কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিই—

গিয়েছিল যারা অরণ্যে ফুল কুড়াতে
গিয়েছিল যারা পর্বতে জুম পোড়াতে
গিয়েছিল যারা নবতর গৃহ গড়াতে
গিয়েছিল যারা আলোকের ভোর ছড়াতে
ফিরেছে কি তারা দুলিয়ে কাশের গুচ্ছ?
ফিরেছে কি তারা ভেঙে পর্বত উচ্চ?
মন্ত্রীর বাড়ি গ্রিলের সামনে কারা এ?
ভেঙেছে কি বাঁধ মরুকঙ্কর মাড়ায়ে?

হাংরি বলে খ্যাত প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্যের কবিতা কি সত্যি হাংরি, না ষাটের দশকের প্রতিবাদী কবিকেই দেখি যে-রকম— "জ্বরের ঘোর বেড়ে না গেলে / স্বপ্ন বিকশিত হয় না। স্বপ্ন / অর্থাৎ চাওয়ার তীব্রতা— তীব্র ক্ষুধা— / জ্বর জ্বর / ভালোবাসার জ্বর / ঘৃণাতাড়িতের জ্বর / বিদ্রোহের জ্বর / পলাতকের হাজার মাইল দীর্ঘ জ্বর— / একজন তাড়িত মানুষের কোন বয়স নেই / একজন বিপ্লবীর প্রধান হাতিয়ার / তার বুকের গভীর জ্বর / একজন কবির জ্বর প্রবাহিত নদী।" ('জ্বর'— প্রদীপ চৌধুরী)

প্রতিবাদী শঙ্খপল্লব 'লিলুয়াবাজারের সমুদ্র সাঁতার' কবিতায় বলেন : "শব্দতন্ত্র আসল সত্য নয়, কিছু ফোঁস, বাকিটা জঞ্জাল / সমুদ্র সাঁতারের মুরদ নেই, ভরসা তাই কাটাখাল / সাবধান! সামনে দাঁড়াবি না। ছিঁড়ে খাবে আলকুচি জিব / পাত্তাই দেব না অশ্রু-শব্দ স্রোত-নিশ্বাস, আলাপনী ঢিবঢিব।"

পীযূষ রাউত ত্রিপুরার সবচেয়ে পরিচিত কবি। পীযূষের বৈশিষ্ট্য, একেবারে মুখের ভাষায় কবিতা রচনা— যেমন, "আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য / চিরকাল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো / যেমন দেশের বাড়িতে / নৌকোর জন্য প্রতীক্ষমান মা ও আমি, আমি ও ছোট ভাই / নদী তীরে / ... আমি ও সান্ত্বনা, সান্ত্বনা ও সৈকত আমরা কয়েকজন / কয়েকজনের

জন্য চিরকাল, / চিরকাল প্রতীক্ষার পথ।"

স্বপন সেনগুপ্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাব্যচর্চার জগতে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। উত্তর-পূর্বের বাঙালির জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য অঞ্চলের বাঙালির থাকার কথা নয়। কিছু বিশেষ শব্দ পর্যন্ত তাকে তাড়া করে অহর্নিশ : বিদেশী, বহিরাগত, ভূমিপুত্র — এ-সব শব্দ কবিকেও ভাবায় — উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে স্বপনের একটি কবিতার উল্লেখ আগেই করেছি। এবার অন্যরকম একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি : "একটা বয়স আছে, যখন কোনও বিচ্ছেদই আর / বিচ্ছেদ বলে মনে হয় না / মনে হয়, নদীর ধর্মে হেঁটে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি, / এবার তো আমারই নাম ডাকার পালা।" ('একটা বয়স আছে'— দহন ও জলস্তর)

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, যিনি হাংরিদের 'স্বকাল' (১৯৬৯) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, তাঁর কবিতায় তিনি লেখেন— "তীর্থজয় রিয়াং, কবে আর কার ধান মেপে দিবে তুমি, / রোজ রাতে অলৌকিক জুমের আগুনে / নদীর রেলিংএ এসে থেমে থাকে, / জঙ্গলের অন্ধকারে বসে থাকে বিষণ্ণ মানুষ ; / কেউ বন্দুক হাতে নিয়ে, কারো কোলে শিশু / ভীত শব্দহীন।"

এই দরদি কবিকে কি আমাদের ক্ষুধার্ত মনে হয়? হয় না তো, বরং মনের গভীরে একটু জায়গা তাঁকে ছেড়ে দিই।

প্রদীপবিকাশ রায়ের কবিতা মন্ত্রের মতো মনের গভীরে চলে যায় যখন তিনি বলেন : "অনন্ত পিপাসা নিয়ে জেগে আছে / অনেক বসন্ত রাত সম্মুখে যজ্ঞের আগুন... / তার পাশে কে ওই লোকটা পাথর-প্রতিম? / মন্ত্র মুখরতায় বিড় বিড় করে বলে যায় / অনন্তমনন দাও অনন্তমনন।" ('অনন্তমনন', নির্বাচিত কবিতা)

এবারে আমি আসি বৃহত্তর আসাম অঞ্চলের কবিতায়।

এখানে বলি, পঞ্চাশের দশকে কিংবা তারও আগে এ-অঞ্চলের যে-সব শক্তিশালী কবি কলকাতায় পাড়ি দিলেন এবং এ-অঞ্চলের কাব্যচর্চার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হল, তেমন খ্যাতিমান কবিদের কথা আমি আমার এ-আলোচনায় আনব না। স্বাধীনতার পর যথার্থ অর্থে আসাম অঞ্চলের কবি বলেই যাঁদের ক্রিয়াশীল দেখেছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যে-নাম মনে পড়ে তিনি কবি সুধীর সেন। পঞ্চাশের শুরুতেই, তখন তিনি করিমগঞ্জে, কবিতার বই 'একফালি ঘাস' প্রকাশিত হল। তাঁর একটি কবিতা পড়ি :

"চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বুঝি নয়,
মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নয়;
তবুও সে দাঁড়ালো এসে আলোকিত মঞ্চের ওপর
বিলম্বিত লয়ে নৃত্যপর—
ডোরা কাটা শাড়ি তার শরীরে পেঁচানো
সাপের মতন,
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।"

('রিহাং নৃত্য'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

সুধীর সেনেরও আগেকার আরেক কবি দেবেন্দ্র পালচৌধুরীর কবিতায় তাঁর সৈনিক জীবনের গান শুনি :

"সৈনিক তারি নাম
শৌর্যে ধন্য অন্তর তার ভালবাসা উদ্দাম।
বলিতে কি পার মোরে
কোন দেশে তুমি যাইবে এখন কোথা থেকে কতদূরে।"

('সৈনিক'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

কবি করুণারঞ্জনের কবিতায় পাই এক গ্রামীণ পরিবেশের পরিচয় :

"ঐ ছিল গ্রামীণ পরিবেশ
লোকগীতি এন্তার চিন্তার তিল তিসি ক্ষেতে
কন্টিকারী চেয়ে আছে...
তবুও ফাল্গুনে পলাশ ফুটে গাছে।"

('তিল তিসি নক্ষত্রের ক্ষেতে'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

কবি অনুরূপা বিশ্বাস, বামপন্থী সমাজ-সচেতনতা নিয়ে যিনি পরাধীন দেশে রাজনীতিতে নেমেছিলেন ছাত্রজীবনে, তাঁর কবিতায় সেই চেতনা আমরা দেখি :

"শ্মশান চণ্ডাল হাঁক পাড়ছে থেকে থেকে
লম্বা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলছে চিতার আগুন
বিষম পরিণামের শক্ত গেরোয় ত্রিশঙ্কু জীবন
বধ্যভূমিতে পাটাতনের উপর কাঁপছে—
আমি দেব না আর কিছু দেব না
এই দেখ মুঠো বন্ধ করছি
... ...
ঘুরে দাঁড়িয়েছি ফিরে যাব বলে।"

('এমন পরবাসে'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

পঞ্চাশের দশকে শিলং ছেড়ে কলকাতা গিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। আর সেই দশকেই 'পরবাসী' গ্রন্থের কবি বাংলা কবিতায় নিজের একটি সম্মানের স্থান করে নেন। এক দশক পরে আবার ফিরে এলেন আসামে, সারা কর্মজীবন কাটালেন শিলঙে আর গুয়াহাটিতে। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কবি বাংলা কবিতার গৌরব। বীরেন্দ্রনাথ আসলে গভীরতার কবি, আপাত-দুর্বোধ্য এই কবি পাঠকের মস্তিষ্কে নয়, মনের অন্তর্ভুবনে কথা বলেন; শুনি একটুখানি :

"ক্রমশ ধোপানি আসে, একা একা কাপড় কাচতে কাচতে
আসে প্রাণে;
কোন্ প্রাণ পুষ্করিণী, যেখানে শালুকও অতি রিক্ত কুসুম।
... ...
সপ্রাণ সফেন সব নরনারী কাপড়েরই মতো শুকনো মাড়ে
খরখর করছে; নাও ইস্ত্রি করো, প্রাণ ঐ দু'তিন ভাঁজের
তেনা তেনা।"

('ক্রমশ ধোপানি আসে', ৩২ যোগিনী বসিবেক)

কত শিল্পিত হয়েছে ভাষা। ভাবুন কোন্ প্রাণ পুষ্করিণী— তবু ঐ দু'তিন ভাঁজের তেনা তেনা।

আবার দেখি এই অঞ্চলের ভাষা কীভাবে আসে তাঁর অনুভূতিতে :

"চেরাপুঞ্জি থেকে ভায়া শিলং— অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে/ পাঠাও যে মেঘ, তার পাঁচ হাজার ফুট নীচে— জল / পড়ে আছে বাংলা ভাষা / ভাষা ওঠে পর্বতারোহীর পিছে পিছে।" ('চিঠি', সাক্ষাৎকার)

এবার বহু আলোচিত কাছাড় কাব্য-আন্দোলন বা অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলনের কবিদের কাছে আসি। আসামের সেকালের শান্ত কাব্যিক পরিবেশ হঠাৎ ক'জন তরুণের আবির্ভাবে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। 'অতন্দ্র' পত্রিকাকে মুখপত্র করে আসরে নেমেই ঢাকে কাঠি দিলেন উদয়ন ঘোষ—

"গুড় গুড় ঢ্যাং কুড় কুড় গুড় গুড় ঢ্যাং কুড় কুড়
এবার বাজাব ঢাক ছুঁড়ি তোর গায়ে সুড় সুড়
লাগে যদি আমরা নাচার।
বহমান নদীর মতন কমনীয় পাছা ও স্তন
এগুলো এমন ভীষণ লুকোবি কোথায় বা বল?
বহুদিন সয়েছি শোন
বহুদিন সয়েছি শোন
এবারে ফাটাবো কান।"

শক্তিপদ শোনালেন—

"বিষ্টি-বিষ্টি অনাচ্ছিষ্টি ভেতরে তুল্‌কালাম কাণ্ড
মেয়ে মানুষ খেয়াল গাচ্ছে লোপাট হচ্ছে মধুর ভাণ্ড
সব শেয়ালের এক রা হুজুর মধুবাতা ঋতায়তে
নাগালয়ে মা ভবানী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে।"

বিমল চৌধুরী খুব শান্ত মানুষ, তিনিও কম গেলেন না। আর বিশ্বজিৎ চৌধুরী তো সেই মুরজের আমল থেকেই খেপিয়ে বেড়ান। শান্তনু, জিতেন নাগ, অতীন দাশ পর্যন্ত কেউ কম গেলেন না। বিরোধ বেঁধেই ছিল প্রবীণদের সঙ্গে, তবু আমি যখন এলাম আমাকে তাঁরা চিহ্নিত করলেন, এবং বিশ্বজিৎকেও বিরোধিতার প্রধান কারিগর বলে। যা-ও একটু লোকদেখানো মিল ছিল তা-ও গেল ভেঙে। আসলে জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, কবিতার ভাষাভঙ্গি সব কিছুতেই এক নতুন চেহারা, গেল গেল রব পড়ে গেল কাছাড়ের কাব্যভুবনে— গর্জে উঠলেন প্রবীণ কবিরা, আরও অনেকেই। সে-সময় স্কুলশিক্ষক শক্তিপদ ও বিমল চৌধুরীকে চাকরি থেকে তাড়ানোর প্রস্তাব এল প্রকাশ্যে, আড়ালে। কিন্তু শেষ জয় হল নতুনের— অতন্দ্রের কবিদের দল বাড়তে লাগল, রুচিরা শ্যাম, উমা ভট্টাচার্যরা তো ছিলেনই, এলেন রণজিৎ দাশ আর মনোতোষ চক্রবর্তীও। তাঁরা কি কেবল খেপিয়ে বেড়ালেন পাঠকদের? না, তাঁরা এক নতুন ভাষায় আত্মকথন শুরু করলেন, আর যখন হইচই শান্ত হয়ে গেছে তখন ডুব দিলেন অন্য গভীরতায়, বিষাদে, বিদ্রূপে, ভালোবাসায়, মগ্নতায়। শুনি সেই কণ্ঠগুলি।

সাধারণ মানুষের জীবনের বুকের ভাষা, বিশ্বাস, জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় চিহ্নিত করেন শক্তিপদ এইভাবে :

"কোথায় নিছনি কোথা চম্পক নগর
সাতনরী শিকা ঝোলে ঘরের ভিতর
কুপি লম্ফে রাতকানা নিরক্ষরা বুড়ি
লখার মরণে কান্দে আছুড়ি পিছুড়ি
জালটানা ছেলে আজ রাতে গেছে বনে
রেখো মা মানসা তার সর্বাঙ্গ কুশলে।"

('মনসামঙ্গল', অনন্ত ভাসানে)

বিমল চৌধুরী লিখলেন :

"হাট করে দোর খুলে দিলাম
শুকনো বাতাস কেবল খেলা
হাড়-কাঁপানো পাল্লা দুটোর
অবশডানা কেবল খেলা।
অঙ্গরাগেই সুবাস ছিল
ক্ষণম ইহ কেবল খেলা
পত্রমোচন তাই তো এবার
হৃদয় ভরে কেবল খেলা।"

('কেবল খেলা')

আর উদয়ন ঘোষ, ঢ্যাং কুড় কুড়ের উদয়ন ঘোষ লিখলেন—

"একেকটা দিন অন্ধকারে তোমরা আমার আহত মুখ দেখ
একেকটা দিন গভীর রেখায় আমর্মমূল অমল উন্মোচনে
... ...
সুদীর্ঘকাল মৃত গোলাপ 'ক্লান্ত জলে টুকরো চাঁদের ফালি'
সুদীর্ঘকাল একলা ঘরে সুদীর্ঘকাল রাতের ট্রেনে পাড়ি।"

('একদিন, অনেকদিন ও তোমরা'— ঝোপ জঙ্গলের কবিতা)

অন্যদেরও কবিতার একটু একটু অংশ রাখি পাঠকের কাছে। অতন্দ্র-সাহিত্য গোষ্ঠীর কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতা—

"হত্যাকারী ছুঁয়ে দেয় মধ্যরাতে
অভিমানী আলো তার রক্তময় হাতে।
প্রতিধ্বনি
শুভ্র বুকে বহে আনে সে কোন রমণী;
দীর্ঘতম সেতু
পার হলে এখন যেহেতু
হিরণ্ময় প্রেম ক্ষমার মতন আজো..."

('মধ্যযামিনীর আলো', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

রুচিরার 'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতায় যে-বিষাদ তার ছায়া দেখি এইভাবে:

"আর এ বৃক্ষের ছায়া দীর্ঘায়িত হবে না উদ্যানে
পাথেয় গুছিয়ে নাও চর্মপাত্রে ভরে রাখো জল,
হে আমার প্রিয়তম, হে আমার নিশ্চিত নির্বেদ,
ত্রিতাপ তৃষ্ণার শান্তি পাঠ করো আনত নয়নে
সব পাতা ঝরে যায় নির্বিকার অবর্ণ সময়।"

বিশ্বজিৎ তাঁর 'শরীর দুঃখের অথবা সুখের খেলায়' কবিতায় নিজেকেই বলেন :

"শরীর সোনা তুমি এইভাবে শুয়ে থাকো পায়ের তলায়
অথবা সাদা বিছানায় চাদরে চুপচাপ
আরো অ-নে-ক দিন বেঁচে থাকতে হবে ওস্তাদ
একই জন্মে
দুঃখের অথবা সুখের খেলায়।"

শান্তনু ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বাংলা কবিতার জগতে, জয় করে এনেছিল 'কৃত্তিবাস পুরস্কার'। তাঁর 'এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে' কবিতার শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তি—

"আমি চাই তুমি অন্যরকম হও
শাড়ির বাতাসে নিহত চঞ্চল, হাসি কুলকুচো করো
সাবানের ফেনার মত বিষাদ নাড়াও, হয়ে লুণ্ঠিত বৈভব
শুধু কণ্ঠ তুলে 'তুমি দেখ'
আর অমনি তুমি মায়ের পায়ের কাছে, কেবলই থমকানো
চোখ
এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে।"

রণজিৎ দাশ বললেন তাঁর 'প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন' কবিতায়—

"প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন— এই কথা বলে আমি
আকাশের দিকে তাকাবো না, কারণ আকাশ ভারি স্থিতিশীল
সেখানে সচরাচর গ্রহণ-দরজা আগলে বুড়ো সূর্য
পাহারায় থাকে।"

আর মনোতোষ চক্রবর্তী, অতন্দ্রের কনিষ্ঠতম কবি লিখলেন—

"তীর্থযাত্রী নই তবু এগিয়ে চলেছি পথ ভীষণ দুর্গম
চতুর্দিকে নদীর গোলকধাঁধা, চেকপোষ্ট, সে কি কিছু কম
পথে পথে দৃশ্য : নদী ও বনের কাছে এত প্রাপ্য ছিল
চূড়ায় বরফ জমা, দূরে রৌদ্র-বিচ্ছুরণে চমৎকার ছিল
বাদশার মত দেখি, এ' ভুবনে আমি একা দেখেছি সুনীল।"

('পরশুরাম কুণ্ডে', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

অতন্দ্রের কবিদের পরিচয় হল কিছু কিছু। শতাব্দীর অতীন দাশ এ-সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি, সেকালে তিনি লিখছেন—

"আমরা জানি কি কেন এই আয়োজন
হঠাৎ হৃদয় বিহ্বল হয়ে দোলে
এত যে সন্ধ্যা কাটলো অমল স্বপ্নে
তাঁর স্মৃতি বেঁচে রবে কি হৃদয় কূলে?"

('লাগ্নিক', সাহিত্য-৩)

ওদিকে ডিব্রুগড়ে, যোরহাটে আরেক কবি ষাটের উর্ধ্বেন্দু দাশ কিছুদিন চুপচাপ থেকে সত্তরে আবার বেরিয়ে এলেন প্রকাশ্যে— বললেন :

"কি বিভোর ঘুম ঘুম গন্ধ নিয়ে জেগে এই নভোলীন
নিসর্গ, — রাত
কেমন জড়িমাহীন, দ্বিধাহীন, ক্ষিপ্রতার রুপোজরি জ্যোৎস্নার
নীল
ঝলমলে আঁচল খুলে নিভাঁজ উড়িয়ে দ্যায়
অরণ্যের বীজপত্রে, জুমশস্যে
নাহরের পুষ্পল চুড়োয়—"

('অরুণাচলে ভোর', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

শিলং শহরে রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধরেরা নতুন করে কাগজ করছেন কবিতার, কলকাতা থেকে আগত মৃণাল কিংবা শকর চক্রবর্তীদের সমান্তরালে তাঁদের কাগজ, কবিতাচর্চায় একেবারে এ-অঞ্চলের সৌরভ। রমানাথ লিখছেন—

"ভালোবাসা ডাক দিলে আমি কি দাঁড়াতে পারি স্থির পায়
যেমন দাঁড়িয়ে থাকে মধ্যরাতে ঘর
দু'হাত বাড়িয়ে দিই ছন্দময় সুখে
যেভাবে জলের গায় কিষাণ ডুবিয়ে দেয় ঘামে ভেজা
মুখ।"

('ভালোবাসা ডাক দিলে', নির্বাচিত কবিতা)

পীযূষ ধর লিখলেন—

"উমসিং নদীর জল নিংড়ে কিছু বালি
তুমি শুধু স্তূপীকৃত করে যাও। ওর
চোখ মুখ আর
ঝিলমিল ঠোঁট থেকে।"

('প্রত্যহ শিলং', নির্বাচিত সাহিত্য-১)

কিরণশংকর রায় আরেকজন কবি যিনি ত্রিপুরায় কাব্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন ষাটের দশকেই, কিন্তু তার পরবর্তী দশক থেকে বরাক উপত্যকায় এসে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখলেন—

"যে-কেউই ভাবে
একা হাঁটা শুধু হাঁটা নয়— সে-ও পথ, একলার পথ
হয়ত বা ভুল করে ভাবে— একা হাঁটা খুবই সংক্রামক
তবু
মানুষ ছাড়িয়ে পাথরের দিকে যায় শেষে
অথবা পাথর থেকে মানুষ ছড়ায়।"

('হাঁটাপথ', ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

৯

বলেছিলাম তাঁদের কথা আনব না, যাঁরা একসময় এ-অঞ্চল ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কলকাতার কবি হয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে হয় করুণাসিন্ধুর কথাটা না-বলা ঠিক নয়। পঞ্চাশের দশকে কেবল কবিতার জন্য 'স্বপ্নিল' প্রকাশ করে এ-অঞ্চলে আধুনিক কবিতার ধারা প্রথম নিয়ে এসেছিলেন— সেই করুণা ফিরলেন কাছাড়েই আবার, কিন্তু কবিতার জগৎ যেন ছেড়েই দিলেন। নব্বই-এর দশকে এসে আবার যখন আত্মপ্রকাশ করলেন বরাক উপত্যকার কাগজেই, আমরা জানলাম তিনি একটুও ফুরিয়ে যাননি, লুকিয়ে ছিলেন মাত্র এবং তাঁর মনে হল—

"নীরব কবির কোন ভাষা নেই, আশা নেই মূঢ়;
মনে মনে কল্পনায় রাজহাঁস খেলা করে যায়
অদৃশ্য আলোকে,— তাতে এমন কি বিস্ময় নিগূঢ়
শ্যামের তুড়িতে বাজে রাধার তেহাই চেতনায়।"

(সাহিত্য-৫৩)

বাংলা কাব্যে অসাধারণ সব সনেটের জন্য করুণাসিন্ধু দে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৬৭-তে 'আসামে আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে, এর পরে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র ভূমিকায় লিখেছিলাম, "আজকে কাছাড়ের কবিতাই আসামের বাংলা কবিতা"— তারপর অনেক কাল চলে গেছে, বৃহত্তর আসামের দিকে দিকে অনেক শক্তিমান কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের কথা আমি যথাসাধ্য বলেছি— তবু আজও বলি, গত শতাব্দীতে আসামে বাংলা কবিতায় এবং আজ পর্যন্তও বরাক উপত্যকার অবদান সর্বাধিক। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য যেমন বরাক উপত্যকার মানুষই কেবল বারবার সংগ্রাম করেছেন, শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক অবদান রেখেছেন এই

উপত্যকারই কবিরা। আমার আলোচনা দীর্ঘ হচ্ছে জানি, তবু শোনাই তাঁদের কয়েকজনের কণ্ঠস্বর, সত্তরের দশক থেকে একেবারে দু'হাজার পর্যন্ত যাঁরা মাতিয়ে রাখলেন এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতাকে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন বৃহত্তর বাংলা কবিতার অঙ্গনে।

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য :

"এই মাঠ, বেনোজলে হাঁসফাঁস ধানের ক্ষেতের মাঠ
চোখের জলের স্মৃতি ধুয়ে ফেলে স্রোতের আবেগে—
আঁকড়ে ধরেছে দেখো পলির আশ্বাস
তার স্বপ্ন।"

('এই মাঠ শ্রাবণের', অনন্ত নীরব)

তপোধীর ভট্টাচার্য :

"আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে?
যাও, তার জলের করুণা
শিখে নিয়ো।
লাজুক সন্ধ্যার চোখে নিমীলিত
অশ্রু ফুটেছিল, তাকে
ভুলে যেয়ো।"

('যাও', নির্বাচিত সাহিত্য-১)

দীপঙ্কর নাথ :

"কোনদিন জলপ্রপাতের মতো প্রেম
আসে, অই কিশোরীর— তোমাদের প্রত্যেকের
বুকে সেই প্রসারিত শব্দ হয়, আমিও অধীর
হয়েছি প্রেমে তার।"

('কোন দিন', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

দিলীপকান্তি লস্কর :

"এদের জন্য দু'চোখ ঝরে? ঝরুক বুক চেপে সহ্য কর
একটু হলেই শুনে ফেলবে
খট্ খট্ খট্ কার্ফু মাটি থর্ থর্ থর্।
যীশুর ঘিলু ছিন্নভিন্ন, জগন রক্ত ধড়
এই বিপদে মাতৃভাষায় কান্না বন্ধ কর।"

('৮৬-এর ২২ জুলাই রাতে, সুমনাকে', সাহিত্য-১৯)

ভক্ত সিং :

"মায়াবী হলুদ বড় কাছে টানে
পাহাড় লাইন বেয়ে ঝিক ঝিক মহুয়ার ট্রেন
সুখে আছি এই বলে
রুমাল উড়িয়ে যাওয়া ধবধবে নারী ও পুরুষ
... ...
চলো মাটিতে বর্শার মতো গেঁথে দিই
মানুষের উজ্জ্বল আকাশ।"

('মাটিতে বর্শার মতো', সাহিত্য নবপর্যায়-১)

দেবাশিস তরফদার :

"শরৎ। আনন্দে বাড়ি-ফেরা।
সাজিয়েছ ঘাসের ডালি অনেকদূর।
বসিয়েছ লালবাড়ি লাল কাঁকরের পথ
ফিরিয়ে এনেছ নীলাকাশ।
... ...
রিক্তঘরে দুখীঘরে তার বরণ
আনন্দের গৃহে আগমন।"

('আগস্ট ৯৫', সাহিত্য-৫৬)

শঙ্করজ্যোতি দেব :

"আশার দহন আর বোধের কামড়ে
গড়ে ওঠে দাক্ষিণ্যের ঘর, হে পূর্ণতা
সফল মেঘের মতো ভোর হয়ে এসো
ভোর হয়ে এসো ফিরে ফসলের ঘরে।"

('নবান্ন', সাহিত্য নবপর্যায়-৩)

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য :

"একটা জীবন ঝরে পড়লো
সামান্য সে ক্ষতি
যুগ্মচিতায় পুড়লো শবদেহ
সারারাত্তির ছড়ায় আলো
হিরণ্য মোমবাতি
সারারাত্তির একই দাবদাহ।"

('একটা জীবন', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

অমিতাভ দেব চৌধুরী :

"ভোরের ময়লা ফেলা গাড়ি এই শহরের
প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে সুগন্ধ, ফুলের।
বুকে বহে নিয়ে যায় সভ্যতার পুঁজ,
গলিত আঁধার লিপি মালা হররোজ
... ...

এ কথা জানে না গাড়ি, স্বপ্নে ফুল ঝরে
দিনের ধুলায় তার ইতিহাস ওড়ে।"

('ফুল কাহিনী', সাহিত্য-৭৭)

স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য :

"প্রথমে ফেরাও মুখ
আড়চোখে আবার তাকাও
ভ্রূভঙ্গে চাঁদের মতো
উঁকি দেয় তৃতীয় নয়ন।"

('দেবী', সাহিত্য-৪৩)

সুব্রতকুমার রায় :

"এখান থেকে গ্রাম খুব দূরে নয়
মাঝে মাঝে যাই শহরতলী, কাঠের সাঁকো পেরিয়ে
মেঠোপথ হেঁটে, নদীর পাশে বসে বসে দেখি
দিগন্তে আদিগন্ত মিশে যেতে
ভাবি গ্রাম তার কাছাকাছি খুব।"

('আঁধার গ্রাম', সাহিত্য-৭৮)

এইভাবে অনেকের কবিতার কিছু উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি মনে আসে। যাঁদের কথা বলি, থেকে যায় আরও বেশি জনের কথা। আসলে সীমিত পরিসরে একজন কবিকে নিয়ে বলা সহজ, তাঁর কবিতার বিশেষ দিক নিয়ে বলা আরও সহজ, কিন্তু যখন দশজনকে নিয়ে বলতে হয় তখনই সময় ভাগ করতে হয়, আর এ-সংখ্যা যদি একশো হয় একসঙ্গে তাহলে তাঁদের বিচার করতে গেলে অবিচারই হয় কেবল। এখানেও হয়তো অনেকের প্রতি অবিচারের প্রশ্ন উঠবে। তবু এই হয়, এই হবে— আমার বলায় হবে, সকলের বলাতেই হবে। হবে না কেবল সেই কবিদের ক্ষেত্রে যাঁরা অনেককে ছাপিয়ে যান স্বাভাবিক প্রতিভায়। আমরা, কবিতাপাঠকরা তেমন মুখ অনেক দেখি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতায়। এবং তাঁদের বিকাশের পথ চেয়ে থাকি।

পরিশেষে একটা কথা বলি। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং চর্চার যে-অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি তাতে নিশ্চিত করে বলতে পারি, বাংলা কবিতায় এই তৃতীয় ভুবন অচিরকালের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভুবনের অধিকার অর্জন করবে— বাংলা কাব্যকে করবে আরও গৌরবান্বিত। ❑

তথ্যসূত্র :

১ ('উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, সমস্যা ও সম্ভাবনা') উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য ১ম খণ্ড, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১১-১২, সাহিত্য প্রকাশনী

২ ওই, পৃ. ১৬

৩ রবি চক্রবর্তী ও কলিম খানের লেখা 'বাংলা ভাষা প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পৃ. ২৪১, ভাষাবিন্যাস ২০০৬

৪ 'ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা', ধবলকৃষ্ণ দেব বর্মন। ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, প্রকাশক ত্রিপুরা সরকার

৫ 'কবিতার ইস্‌কুল মাস্টারি, আউলা ঝাউলা', বিমল চৌধুরী, পৃ. ৬৯, সাহিত্য প্রকাশনী

৬ 'ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সাহিত্য', স্বপন সেনগুপ্ত, সাহিত্য-৮৪

৭ 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য ২য় খণ্ড', বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৪, সাহিত্য প্রকাশনী

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩'-সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ডস কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি-সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

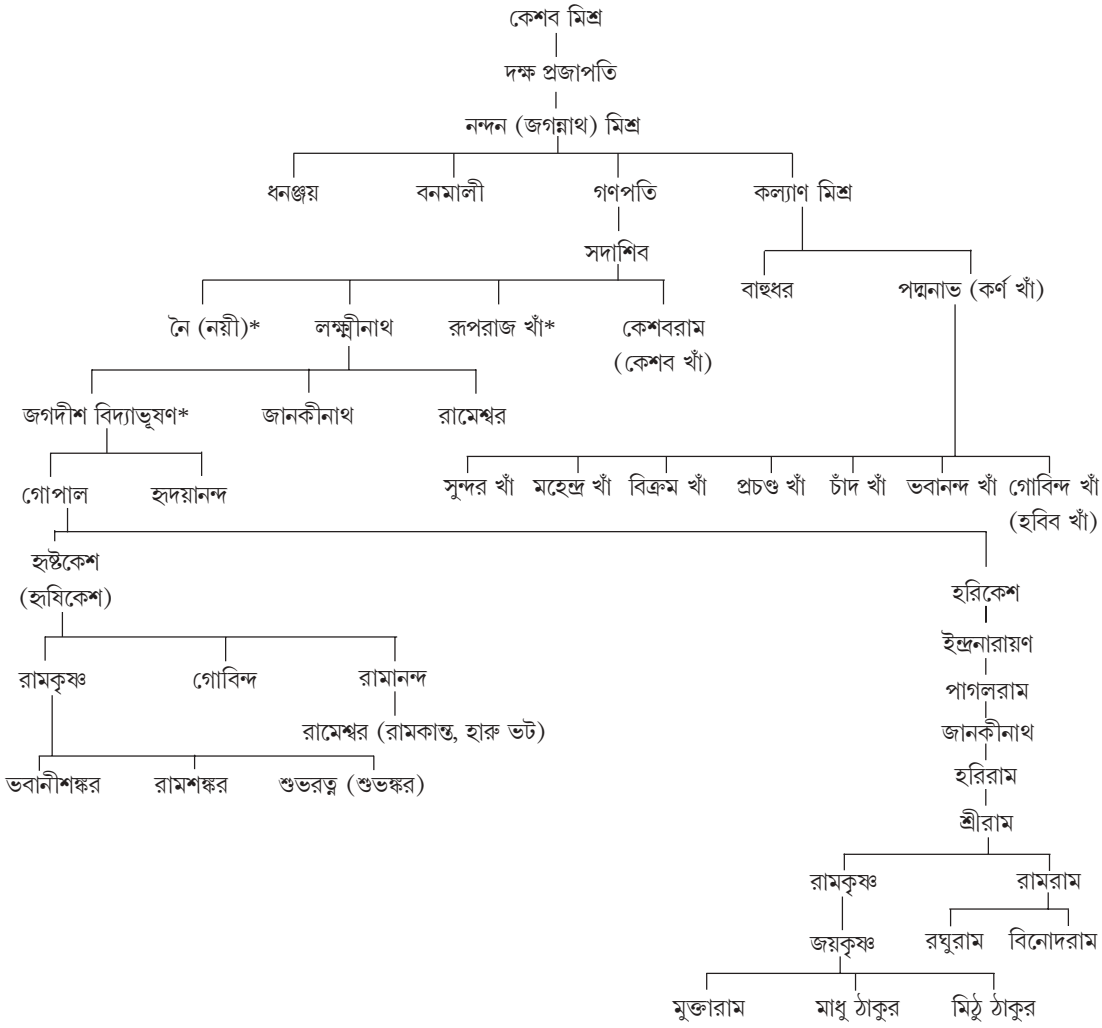

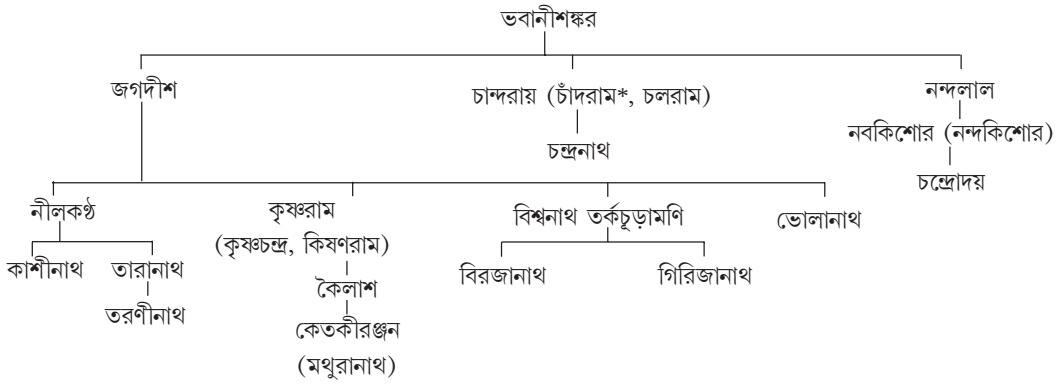

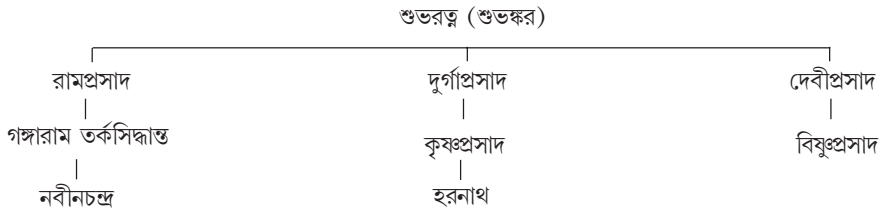

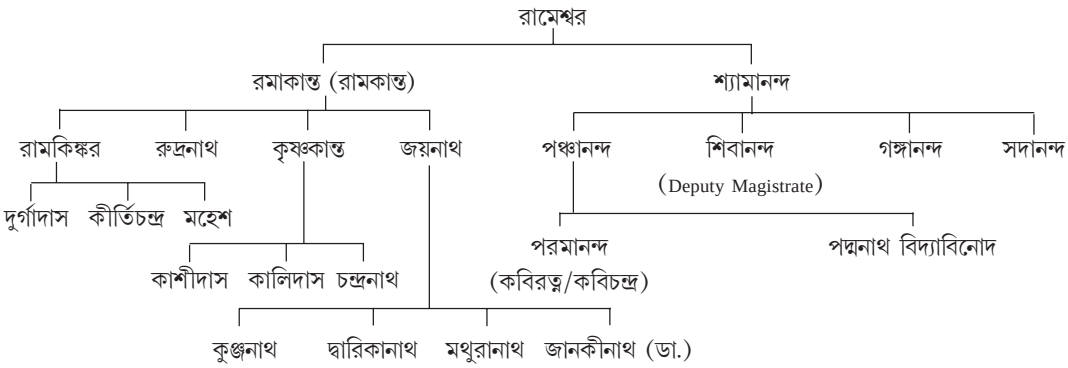

- ভবানীশঙ্কর
  - জগদীশ
    - নীলকণ্ঠ
      - কাশীনাথ
      - তারানাথ
        - তরণীনাথ
    - কৃষ্ণরাম (কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
      - কৈলাশ
        - কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
    - বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
      - বিরজানাথ
      - গিরিজানাথ
    - ভোলানাথ
  - চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
    - চন্দ্রনাথ
  - নন্দলাল
    - নবকিশোর (নন্দকিশোর)
      - চন্দ্রোদয়

- শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
  - রামপ্রসাদ
    - গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
      - নবীনচন্দ্র
  - দুর্গাপ্রসাদ
    - কৃষ্ণপ্রসাদ
      - হরনাথ
  - দেবীপ্রসাদ
    - বিষ্ণুপ্রসাদ

- রামেশ্বর
  - রমাকান্ত (রামকান্ত)
    - রামকিঙ্কর
      - দুর্গাদাস
      - কীর্তিচন্দ্র
      - মহেশ
    - রুদ্রনাথ
    - কৃষ্ণকান্ত
      - কাশীদাস
      - কালিদাস
      - চন্দ্রনাথ
    - জয়নাথ
      - কুঞ্জনাথ
      - দ্বারিকানাথ
      - মথুরানাথ
      - জানকীনাথ (ডা.)
  - শ্যামানন্দ
    - পঞ্চানন্দ
      - পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
      - পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
    - শিবানন্দ (Deputy Magistrate)
    - গঙ্গানন্দ
    - সদানন্দ

- দুর্গাদাস
  - নীরদ
    - ননীগোপাল
      - নীলকমল
        - নবনীত
    - সূর্যগোপাল
    - নন্দগোপাল
    - গুরুদয়াল
    - সুব্রত

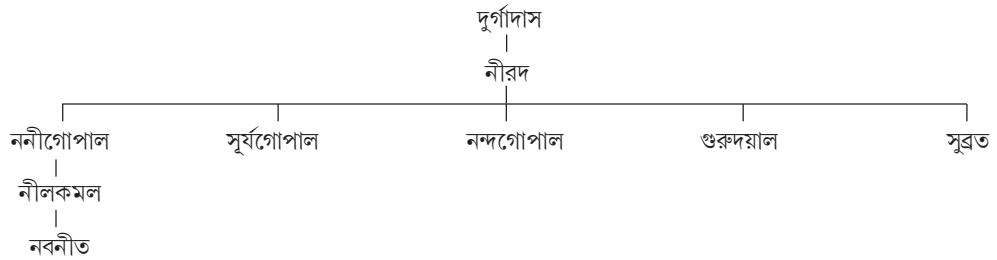

- কীর্তিচন্দ্র
  - দক্ষিণারঞ্জন
    - দ্বিজেন্দ্র
      - দীপক
      - অলক
        - দেবোপম
    - দীনেন্দ্র
    - দেবজ্যোতি
      - দেবাশিস
      - দিবাকর
        - পারিজাত
    - দিলীপ

- জানকীনাথ (ডা.)
  - রজনীনাথ
    - রমেন্দ্রনাথ
      - ঋতব্রত
        - সুদীপ্ত
      - শান্তনু (সন্ন্যাসী)
    - রণেন্দ্রনাথ
    - রঞ্জনকুমার
      - রাহুল
  - রমণীমোহন
    - রণজিৎ
      - দেবাশিস
      - দেবজ্যোতি
      - দেবব্রত
    - রমানাথ
      - শ্যামাশিস
    - রণবীর
      - রঞ্জন
  - হৃষীকেশ (কবিরাজ)
  - কালীপদ

- পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
  - পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
    - পরমেশ
      - পুষ্পক
        - রৌণক
      - পল্লব
    - পরিতোষ
      - প্রদ্যোত
        - পরজ
      - প্রসূন
    - প্রিয়তোষ
      - প্রদীপ্ত
    - প্রাণতোষ
    - পঙ্কজ
    - পিনাকী
  - প্রমোদচন্দ্র
    - প্রভাকর
    - প্রশান্ত
      - প্রদীপ্ত
    - প্রণব
      - প্রসূন
      - প্রদ্যোত
  - প্রহ্লাদ
    - ফাল্গুনী
      - প্রমিত
    - পার্থসারথি
      - প্রিয়ব্রত
  - পরেশ

- পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
  - পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
    - শক্তিপ্রসাদ
      - কৃষ্ণেন্দু
      - শুভেন্দু
  - বীরূপাক্ষ
    - দেবীপ্রসাদ
      - নবারুণ
      - নীলাঞ্জন
      - সুমাল্য
    - রমাপ্রসাদ
      - রূপায়ণ
    - দেবপ্রসাদ
      - কৌস্তভ
    - হরপ্রসাদ
    - কালীপ্রসাদ
      - অনুভব
    - দুর্গাপ্রসাদ
    - বাণীপ্রসাদ
      - নীলাভ
    - সতীপ্রসাদ

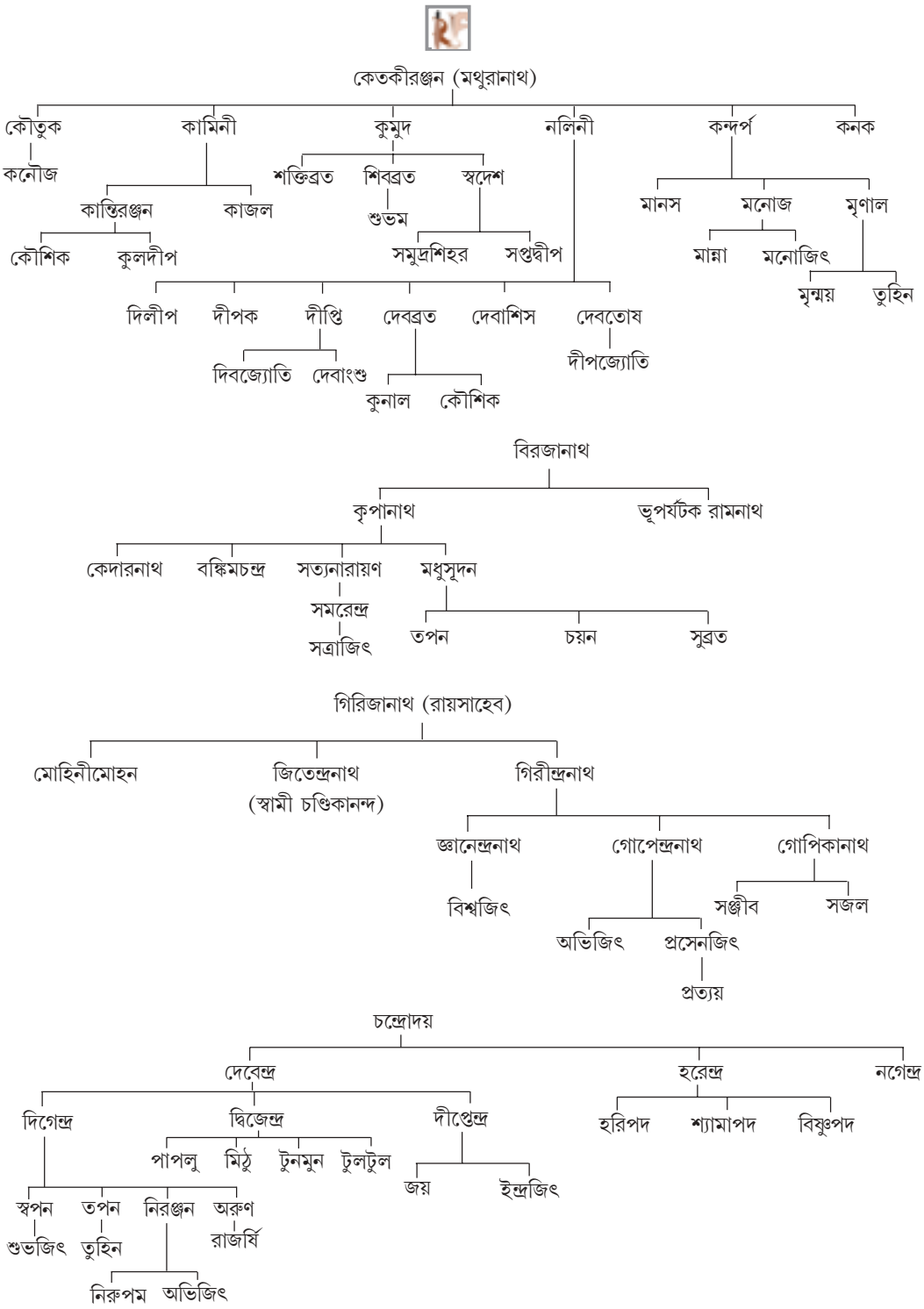
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
শুভম
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক
বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

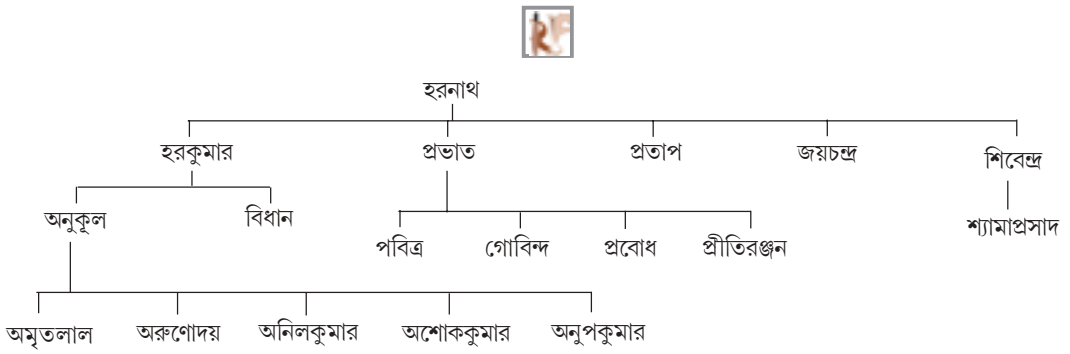

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে — এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। তবে দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়! ❑

মতামত

(এক)

'Senjuti'
21 Kendua Main Road
KOLKATA 700 084
৮ নভেম্বর, ২০১১

শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পাঠানো ... পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ আর রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারের পুস্তিকাটি কাল পেয়েছি। পুস্তিকাটি পড়ে ফেলেছি, নানা তথ্যে বেশ সমৃদ্ধ হয়েছে কাজটি। বক্তৃতা দুটিও ভালো।... ইতি
প্রীত্যর্থী

পবিত্র সরকার

(দুই)

এ২৩ নেতাজি সমবায় আবাস
কলকাতা ১০১
২৪.১১.২০১১

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য,
কবিকনিষ্ঠেষু

ভাই রমানাথ, ১.১১.২০১১-এ লেখা তোমার চিঠি, ... একটি স্মারকগ্রন্থ এবং পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও বিশ্বভ্রমণকারী রামনাথ বিশ্বাসের পরিচয় সহ কবি অজিৎ বরুয়া ও কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য-র উপর লেখা প্রীতিকথন যুক্ত... লেখাটি পেয়েছি। কিন্তু বয়সোচিত আলস্য এবং পঠন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চিঠির সময়ে উত্তর দেওয়া হয়নি। বিজিৎকুমারের কবিতা ও প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়া আমার। কিন্তু অজিৎ বরুয়া সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। তবে রামনাথ বিশ্বাসের বহু বই অতি তরুণ বয়সেই পড়েছি। 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন' একসময় বিপ্লবী চীনকে বাঙালি তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রায় নিত্যপাঠ্য করে তোলার বিষয় করে তুলেছিল। গত ২৯শে অক্টোবর ৭৯ বছর পার হয়ে ৮০ বছরে পা দিয়েছি। এখনও তাঁর চোখ দিয়ে দেখা 'তরুণ তুর্কী', 'লাল চীন', 'আজকের আমেরিকা' ইত্যাদি স্মৃতিতে বিশ্ব আবিষ্কারে জনশিক্ষার আকর পাথেয় বলে মনে করি।... ইতি
নিত্য শুভার্থী

তরুণ সান্যাল